শচীন্দ্রনাথ বসু

মানুষের আগে

মানুষের আগে

মানুষের আগে

বিশ্ব ও পৃথিবীর জন্ম থেকে জীব কুলের ক্রমবিকাশ

শচীন্দ্রনাথ বসু

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা   ১৯৮১

প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৮১

প্রকাশক
ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭-বি, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০১২

মুদ্রক
তপন ধর চৌধুরী
গ্রাফিক আর্ট প্রেস
৩০-ডি, ডায়মণ্ড হারবার রোড
কলিকাতা-৭০০ ০৬০

চিত্রশিল্পী
শচীন্দ্রনাথ বসু
প্রবীর সেনগুপ্ত

প্রচ্ছদ
গ্রাফিক ডিজাইনার্স

দাম
সুলভ ৮.০০
লাইব্রেরী ১২.০০

আমার বালক ভাই

রমিত

যে

'আগেকালের গল্পে' মাতে

এ বই দিলাম তারই হাতে

লেখকের অন্যান্য বই

বিজ্ঞান

প্রাগিতিহাসের মানুষ (রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত)

বিশ্ব বিচিত্র

ভ্রমণ

সব হারানোর দেশে

দেশান্তরী

রম্য রচনা

মিহি ও মোটা

গল্প ও উপন্যাস

নতুন ঠিকানা

সাত সমুদ্র

সীতার স্বয়ংবর

মায়াপুরী

শনিবারের সন্ধ্যায়

কয়েকটি ঋতু

জীবনী

Jagadis Chandra Bose

লেখকের ভূমিকা

কাল হিসাবে সৃষ্টির ইতিহাসে মানুষের স্থান নিতান্তই নগণ্য, নিমেষ মাত্র। তার আগে যুগ যুগ ধরে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণু থেকে প্রাণ বিকশিত হয়েছে নানা দিকে। তারও আগে কোটি কোটি বছর কেটে গিয়েছে পৃথিবীর গায়ে প্রাণ সৃষ্টির অপেক্ষায়। এবং নিঃসীম মহাকাশের পটে তিলাকার এই বসুন্ধরা যখন জন্ম নিয়েছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তখন প্রায় হাজার কোটি বছর প্রাচীন। জ্যোতির্লোকে শুরু হয়ে মানুষের চৌকাঠ পর্যন্ত এই মহাকাহিনী এ বইয়ের বিষয়।

সাম্প্রতিক কালে নানা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি গড়ে ওঠার ফলে পুরাতত্ত্বে দ্রুত নতুন আবিষ্কার ঘটছে, দেশে দেশে আবালবৃদ্ধের আজ এ সম্বন্ধে প্রবল কৌতূহল। এই বিষয় নিয়ে লেখা আমার বই 'প্রাগিতিহাসের মানুষ' প্রায় ১৮ বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল, তার প্রথম অংশে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে বিশ্ব, পৃথিবী ও প্রাণ সৃষ্টি থেকে জীব জগতে অভিব্যক্তির ইতিহাস। বইখানি সমাদর পেয়েছিল বলে এই অংশটি এখন নতুন নাম নিয়ে পৃথক, পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত গ্রন্থ রূপে দেখা দিচ্ছে। এতে বর্তমানে অচল বা স্বল্পমূল্য বস্তু বর্জন করে অন্তর্বর্তী দুই দশকে উদঘাটিত নতুন তথ্য সংযোজন করা হয়েছে,

তা ছাড়া আছে বিভিন্ন প্রসঙ্গের আরও বিস্তারিত আলোচনা। এর সূত্র ধরে মানুষের প্রাগিতিহাসও নবতম তথ্য ও তত্ত্ব সংযোজিত, পরিবর্তিত ও সম্মার্জিত সংস্করণে প্রকাশিত হবে।

ভাষা সম্বন্ধে দু এক কথা বলা দরকার। বাংলা বানান বহুরূপী, এক শব্দের নানা ভেদ দেখা যায়। সরল বানান গ্রহণ করে সে ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য আনতে চেষ্টা করেছি। বিদেশী স্থান ও ব্যক্তির নাম ও অন্যান্য শব্দের তদ্দেশীয় উচ্চারণের দিকে যথাসম্ভব লক্ষ্য রাখা ও সাধারণত যুক্তাক্ষর বর্জন করা হয়েছে; পরিবর্তে প্রথম উল্লেখে হসন্ত ব্যবহার করেছি, ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা না থাকলে (যেমন স্বল্পপরিচিত শব্দে) পরে হসন্ত বর্জিত হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে রোমীয় হরফে শব্দটি আছে। জ়-র উচ্চারণ ইংরেজি z-র মত বুঝতে হবে। পারিভাষিক শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ বইয়ের শেষে সন্নিবিষ্ট হল।

শ্রীমতী সবিতা ধর চৌধুরী একটি নকশা (চিত্র ৭) তৈরিতে সাহায্য করেছেন, তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এপ্রিল ১৯৮১

"অরূপ অকূল বাষ্পমাঝে বিধি কোমর বেঁধে
আকাশটারে কাঁপিয়ে যখন সৃষ্টি দিলেন ফেঁদে
আদ্যযুগের খাটুনিতে পাহাড় হল উচ্চ,
লক্ষযুগের স্বপ্নে পেলেন প্রথম ফুলের গুচ্ছ।"

রবীন্দ্রনাথ

১। বিশ্ব, পৃথিবী, প্রাণ

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, পৃথিবী ও প্রাণ কি করে সৃষ্টি হল এই তিনটি গুরুতর মৌলিক জিজ্ঞাসা মানুষকে প্রাচীন কাল থেকে ভাবিয়েছে, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান আজও সব প্রশ্নের সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট জবাব খুঁজে পায় নি।

বিশ্বের উৎপত্তি নিয়ে কতই না কাহিনী বিভিন্ন জাতির পুরাণে বহু সহস্র বছর ধরে প্রচলিত। অধিকাংশ পুরাকাহিনীতে সৃষ্টি মানে শুধু মর্ত নয়, তার সঙ্গে স্বর্গ বা আকাশলোক অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত, বস্তুত এদের পতি পত্নী রূপেই কল্পনা করা হয়েছে, যেমন মিশরী, গ্রীসীয়, পলিনেশীয় ও অ্যাজ্‌টেক পুরাণে, যেমন বেদের দ্যৌস্পিতা ও পৃথিবী মাতা। মানুষ কুলের আগে এসেছে দেব কুল। সৃষ্টির পূর্বাবস্থার বর্ণনায় প্রায়ই কল্পনা স্তম্ভিত হয়—যথা, অনির্দিষ্ট বিমূর্ত বিশৃঙ্খলা (ব্যাবিলন), গহন অতল (মিশর), কুয়াশাবৃত বিস্ফারিত গহ্বর (আইসল্যান্ড) অসীম আকাশ, নিশ্চল জলরাশি আর অখণ্ড স্তব্ধতা (মধ্য আমেরিকার মায়া সভ্যতা)। সবচেয়ে গম্ভীর বোধহয় ঋগ্‌বেদের প্রসিদ্ধ নাসদীয় সূক্তের বর্ণনা ঃ আরম্ভে সৎ অসৎ, মৃত্যু অমৃতত্ব, আকাশ অন্তরীক্ষ, রাত্রি দিন কিছুই ছিল না ; সর্বব্যাপী তমসার আড়ালে শুধু এক অনির্দিষ্ট বিশৃঙ্খলা, কেবল তাপজাত অদেহী শূন্যতা—তার মধ্যে এক ও অদ্বিতীয়, বায়ু বিনা আপন শক্তিতে নিঃশ্বসিত। ক্রমে দেখা দিল ইচ্ছা, এই ইচ্ছাই আদিম বীজ—এল জননী শক্তি। ...এত বলে ঋষি আবার বলছেন, কিন্তু কে বলতে পারে কোথা থেকে সৃষ্টির উৎপত্তি, পৃথিবীর পরে দেবতাদের জন্ম—তারাও তা জানে না। একমাত্র যিনি আদি হয়তো তিনিই জানেন, হয়তো তিনিও জানেন না।

কি করে আদি বিশৃঙ্খলা থেকে সৃষ্টি দানা বাঁধল, কে বা কি শক্তি তার কর্তা ও কাণ্ডারী এই জটিলতম প্রশ্নেরও বিচিত্র মীমাংসা দেখা যায় পুরা কালের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে, কোথাও কোথাও তাদের কল্পনার সাদৃশ্য বিস্ময়কর। ব্যাবিলনীয় পুরাণে এক দেবতা স্ত্রীরূপী বিশৃঙ্খলাকে দ্বিখণ্ডিত করে বানালে দ্যুলোক ও ভূলোক। চীনের এক কিংবদন্তী আরও কাব্যময়—প্রাথমিক আলো আঁধার, তাপ শীত, শুষ্ক আর্দ্র নির্বিভেদ অবস্থা থেকে যা কিছু সূক্ষ্ম তা ঊর্ধ্বে উঠে সৃষ্টি করল স্বর্গ, যা কিছু স্থূল তা নিচে নেমে হল মর্ত। ঐ দেশের আর এক কাহিনীতে দুই দার্শনিক মহারথের আলাপ চলছে ব্রহ্মাণ্ডের

সূচনা নিয়ে। লাউ-ৎজের বলছেন কনফুসিয়াসকে : এক দিকে বিরাট ঈন্ গম্ভীর নিস্তব্ধ, অন্য দিকে মহান ইয়াং তৎপর সক্রিয় ; দ্যুলোক থেকে নৈঃশব্দ, ভূলোক থেকে ক্রিয়া, দুইয়ে মিলল মিশল—সৃষ্টি হল সব কিছুর। মিশরী পুরাণে দেখি দেবাদিদেব সূর্য সব কিছুর স্রষ্টা, তার ভাবনার থেকে উদ্ভূত আকাশ ও অন্তরীক্ষ, তাদের সন্তান দ্যুলোক ও ভূলোক। গ্রীসীয় উপাখ্যানে প্রথমে অখণ্ড তমসার আড়ালে পক্ষীরূপী রাত্রি এক ডিম পাড়ল, তার খোসার উর্ধ্বাংশ থেকে হল স্বর্গ, নিম্নাংশ থেকে মর্ত, আর ভিতর থেকে কামদেব নির্গত হয়ে এদের বিবাহ ঘটাল, সৃষ্টি হল যক্ষ কুল, দেব কুল। এর সঙ্গে তুলনীয় ছান্দোগ্য উপনিষদের কাহিনী : আদিতে ব্রহ্মার ধ্যান থেকে এক ডিমের সৃষ্টি, ডিম ফেটে হল দু ভাগ, এক অর্ধ রূপার তৈরি, তা পৃথিবী, অন্য ভাগ সোনার, তা আকাশ, আর ভিতরের বিভিন্ন অংশ থেকে হল পর্বত, মেঘ, নদী, সমুদ্র ইত্যাদি। তদ্ যদ্ রজতং সেয়ং পৃথিবী যৎ সুবর্ণং সা দ্যৌর্যজ্জরায়ু তে পর্বতা যদুল্বং সমেঘো নীহারো যা ধমনয়স্তা নদ্যো যদ্বাস্তেয়মুদকং স সমুদ্রঃ ॥ ৩, ১৯, ২

ভাবতে মন্দ লাগে না যে স্বপ্ন, ইচ্ছা বা ভাবনা থেকেই সব কিছুর জন্ম। আধুনিক জ্যোতিষ শাস্ত্রও বলছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গণিতের নিয়মে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা—এবং ভাব বা স্বপ্ন ছাড়া গণিত আর কিছু নয়, তাকেও ধরা ছোঁয়া যায় না। ইংরেজ জ্যোতির্বিৎ জেম্স জীন্স লিখেছিলেন সৃষ্টি কোনও অভ্রান্ত গণিতজ্ঞের মনন বা বিচিন্তা মাত্র। বিজ্ঞান তা বলে এখানেই থেমে থাকে নি। সৃষ্টির আগাগোড়া এবং তার মধ্যে মহাকাল ও মহাকাশের যে বিশাল বিস্তৃতি তা ক্ষুদ্র মানুষের ধারণাতীত হতে পারে, কিন্তু ঐ গণিতের রাস্তা ধরে অন্তত এটুকু বোঝা গিয়েছে যে প্রকাণ্ড হলেও ব্রহ্মাণ্ড অসীম নয়। এবং যেহেতু ঐ সীমার পরিধি প্রতি মুহূর্তে ভীষণ বেগে বেড়ে চলেছে সেহেতু একদা তার শুরুও ছিল। কিন্তু ঐখানে এক দুরূহ প্রশ্ন : শুরুর আগে কি মহাকালের চাকা থেমে ছিল ? সময় তো থেমে থাকে না, তা হলে বিশ্বের কি ইতিহাস ?

মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী জর্জ গ্যামো প্রস্তাব করেছেন যে এক আদিম উত্তপ্ত গ্যাস পিণ্ড থেকে বর্তমান বিশ্বের জন্ম হয়েছিল বহু কোটি বছর আগে। একদা এ সম্বন্ধে তাঁর এক চমৎকার বক্তৃতা শুনবার সুযোগ হয়েছিল, বক্তৃতার শেষে জনৈক শ্রোতার মুখে উপরোক্ত প্রশ্নটির উত্তরে তিনি যা বললেন তা আরও চমৎকার : সৃষ্টির ঘড়ি চলতে আরম্ভ হওয়ার আগে কি ঘটছিল ? বিধাতা তখন ব্যস্ত ছিলেন যারা এই ধরনের বেয়াড়া প্রশ্ন করে তাদের জন্য নরক বানাতে।

যাই হক, বিশ্বের উৎপত্তি ও চরিত্র সম্বন্ধে তিনটি প্রকল্প উল্লেখযোগ্য। গ্যামো

তাঁর তত্ত্ব গড়ে তোলেন বেলজিয়ামের জ্যোতিষী আবে লমেত্র প্রস্তাবিত 'বিস্ফোরণী বিশ্ব' অনুসরণ করে। এতে বলে বর্তমান বিশ্বের সূচনা এক অতিঘন জলন্ত বস্তু পিণ্ডের বিস্ফোরণ থেকে ; এর ফলে এখনও ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্ববস্তু। সৃষ্টির ক্ষণে শুধু বস্তু দেখা দেয় নি, মহাকাশ (space) ও মহাকালেরও জন্ম তখন, সুতরাং বিস্ফোরণ কোথায় ছড়াল বা তার আগে কি ছিল সেই প্রশ্ন ওঠে না। বিক্ষিপ্ত বস্তু দানা বেঁধে দেখা দিল তারা, নীহারিকা ও অন্যান্য জ্যোতিষ্ক। এদের প্রসারণের পরিমাণ ও বেগ হিসাব করে বর্তমান অবস্থার পিছন দিকে গেলে যত বছর আগে আমরা সেই প্রাথমিক ঘনতম অবস্থায় পৌঁছাব তা হল বিশ্বের বয়স। এ ছাড়া অন্য পদ্ধতিও উদ্ভাবিত হয়েছে এবং বাড়তে বাড়তে সংখ্যাটি দাঁড়িয়েছে ১৫০০ থেকে ২০০০ কোটি বছরের মধ্যে, যদিও কারও কারও নতুন মাপজোকে তা মাত্র ১০০০-১২০০ কোটি বছর।

কিন্তু এই প্রসারণের শেষ কোথায় তাও এক সমস্যা। এর সমাধানে প্রস্তাব করা হয়েছে যে নীহারিকাদের পারস্পরিক মহাকর্ষের টানে প্রসারণ ঝিমিয়ে পড়তে পড়তে শেষে এক সময়ে থেমে যাবে, তখন আবার সংকোচন আরম্ভ হবে এবং পশ্চাৎগামী চলচ্চিত্রের মত ক্রমশ বিশ্ব ফিরে যাবে প্রাথমিক অতিঘন উত্তপ্ত বস্তুকেন্দ্রে (পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা এর আর একটা নাম দিয়েছেন 'নৈসর্গিক ডিম্ব'—যেন ব্রহ্মার ধ্যানজাত ডিম)। অতঃপর আবার বিস্ফোরণ এবং প্রসারণ। এই চক্রবৎ চিত্রটির তুলনা করা যায় ঘড়ির দোলক বা হৃদ্‌যন্ত্রের সঙ্গে—আমরা একে বলতে পারি 'স্পন্দিত বিশ্ব'। কিন্তু এ ছাড়া অন্য পরিণতিও সম্ভব। মহাকর্ষের টানে প্রসারণ থেমে সংকোচন শুরু হতে যে পরিমাণ বস্তু বিশ্বে থাকা দরকার তা আছে কিনা এখনও জানা নেই, না থাকলে অনন্ত প্রসারণের পথে জ্বালানি ফুরিয়ে একে একে নিভে যাবে তারা নীহারিকার বাতি, আঁধার শীতল বস্তু কেবলই ছড়াবে দিকে দিকে। পক্ষান্তরে যদি বস্তুর আকর্ষণে সংকোচন ঘটে এবং তা জন্ম কালের মত জলন্ত পিন্ডে এসে থামে তা হলেও আবার বিস্ফোরণ দিয়ে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে কিনা তাই বা কে জানে। হয়তো বা শেষ পর্যন্ত অতিঘন শীতল অন্ধকূপে (black hole) তলিয়ে বিশ্বের মৃত্যু! মহাকাশের এই প্রায় ভুতুড়ে রহস্যগুলি সম্প্রতি জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের উত্তেজিত আলোচনা ও গবেষণার বিষয়। ভারী তারার অবপারমাণবিক জঠরাগ্নি যখন নিভে যেতে আরম্ভ করে তখন বহির্মুখী চাপ কমে যাওয়াতে গ্যাস ছোটে ভিতর দিকে, ফলে তারাটি চুপসে হয়ে পড়ে অতিঘন এক গোলক যার ব্যাস হয়তো তিন চার কিলোমিটার মাত্র এবং প্রতি ঘন সেন্টিমিটারের ভার বহু হাজার কোটি টন। তারার এই শীতল মৃতদেহের যথার্থ নাম হয়েছে অন্ধকূপ। তাদের

প্রচন্ড মহাকর্ষীয় শক্তির বন্ধন কাটিয়ে কোনও রকম বিকিরণই মুক্তি পায় না, সুতরাং তাদের চোখে দেখা বা যন্ত্রে ধরা সম্ভব না। তাই তারা এখনও প্রায় তত্ত্ব জগতেরই বাসিন্দা।

বিশ্বের স্বরূপ সম্বন্ধে ১৯৪৮ সালে ইংরেজ জ্যোতির্বিৎ ফ্রেড হয়েল ও তাঁর দুই সহকর্মী এক অভিনব প্রকল্প পেশ করে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন, এর নাম 'সমাবস্থা বিশ্ব'। এঁরা বলেন এক দিকে যেমন প্রসারণ চলছে, তেমনি ক্রমাগত নতুন হাইড্রোজেন তৈরি হয়ে ফাঁক ভরে দিচ্ছে। এই সৃষ্টি অবিরত ঘটছে, সুতরাং বিশ্বের কোনও শুরু নেই, এবং সর্বত্র সর্ব কালে তার চেহারা মোটামুটি এক। এই তত্ত্বের গুণ যে বিস্ফোরণী বিশ্বের অতিঘন বস্তু কি ভাবে তৈরি হয়েছিল, তার বাইরে কি ছিল, বিস্ফোরণের আগে কি ঘটছিল ইত্যাদি বেয়াড়া প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু এর বিরুদ্ধেও অনেক যুক্তি আছে ; এক বড় আঘাত লাগে ১৯৬৫ সালে বিশ্ববিকীর্ণ রেডিও তরঙ্গের আবিষ্কারে, বিশেষজ্ঞদের মতে তা আদি বিস্ফোরণজাত, এ ছাড়া এই বিকিরণের অন্য কোনও ব্যাখ্যা নেই। হয়েল এখন হার মেনেছেন।

আমাদের পুরাণে উপরোক্ত স্পন্দিত বা দোলায়িত বিশ্বের স্পষ্ট ছবি পাই। মহাভারতে মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে গল্প বলেছিলেন যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চার যুগের এক হাজার চক্রে ব্রহ্মার এক দিন বা এক অর্ধ-কল্প ; এই ৪৩২ কোটি বৎসরান্তে ব্রহ্মার রাত্রি বা প্রলয় কাল ; কল্পান্তে নিদ্রার শেষে জেগে উঠে নারায়ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি আবার আকাশ পৃথিবী স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টি করেন। গীতায়ও এরই প্রতিধ্বনি। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন :

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥ ৮, ১৮

দিন আগমনে অব্যক্ত থেকে সব ব্যক্ত পদার্থ উদ্ভূত হয়, অর্থাৎ নতুন করে সৃষ্টি আরম্ভ হয়, আবার রাত্রি সমাগমে সেই অব্যক্ততেই লীন হয়। এর আগের শ্লোকে ব্রহ্মার প্রতি দিন ও রাত্রিকে বলা হয়েছে সহস্র চতুর্যুগ। আমরা পরে দেখব ইহুদী-খ্রীস্টীয় পুরাণের হিসাবে সৃষ্টি তথা পৃথিবী ও সমগ্র প্রাণী কুলের আবির্ভাব মাত্র কয়েক হাজার বছর আগের ঘটনা। এর তুলনায় ব্রহ্মার এক কল্পার্ধ (৪৩২ কোটি বছর) আধুনিক বিজ্ঞান বর্তমান ব্রহ্মাণ্ডের যে বয়স অনুমান করে তার অনেক কাছাকাছি ; ভারতীয় শাস্ত্র অনুসারে এই ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধেক আয়ুও (২১৬ কোটি বছর) এখন ফুরায় নি।

সৃষ্টি যে অতি প্রাচীন ও অতি প্রকাণ্ড, তার যে চক্রবৎ লয় ও সূচনা ঘটে এই ধারণা ভারতীয় দর্শনের স্বাভাবিক অঙ্গ হলেও প্রাচীন য়োরোপীয় দার্শনিক বিচিন্তার পরিপন্থী।

তবে খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় ছ শো বছর আগে গ্রীসীয় ভাবুক অ্যানাক্সিম্যানডার বলেছিলেন যে ব্রহ্মাণ্ড যে প্রাথমিক উপাদানে তৈরি (উপরোক্ত জ্বলন্ত গ্যাস ?) বার বার তাতেই তা ফিরে যায়, আবার নতুন করে বিবর্তিত হয়। মেক্সিকোর অ্যাজটেক পুরাকাহিনী বলে এর আগে পৃথিবী একে একে প্লাবন, ঝড় ও আগুনে ধ্বংস হয়ে আবার নতুন করে সৃষ্টি হয়েছে।

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুসারে প্রসারণরত বিশ্বের স্থানে স্থানে বস্তু জমে যুগ যুগ ধরে নীহারিকা, তারা ইত্যাদি তৈরি হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। ছায়াপথ বা আকাশগঙ্গা নামে এমনি এক নীহারিকার এক পাশে সূর্য নামক এক অতি সাধারণ তারার বাস, তাকে ঘিরে আরও আটটি গ্রহের সঙ্গে ঘুরছে আমাদের এই পৃথিবী। ছায়াপথের আকৃতি চাকার মত, কিন্তু রাতের আকাশে এক পাশ থেকে দেখি বলে উজ্জ্বল ফিতের মত মনে হয়—এই নীহারিকায় আছে অন্তত ১০,০০০ কোটি তারা, ছায়াপথের উজ্জ্বলতা তাদেরই জ্যোতি।

এমনি আরও অগুনতি নীহারিকা ও অন্যান্য জ্যোতিষ্ক দারুণ বেগে মহাকাশে পরস্পরের থেকে দূরে ধাবমান, তাই বিশ্বের প্রসারণ, যত দূরে যাচ্ছে তত তাদের দ্যুতি বাড়ছে। এ যাবৎ রেডিও দূরবিনের সাহায্যে দূরতম যেটিকে ধরা গিয়েছে সেটি কোআজার জাতীয় জ্যোতিষ্ক (রেডিও দূরবিন রেডিও তরঙ্গকে শব্দে রূপান্তরিত করে), তার বেগ আলো বা রেডিও তরঙ্গের প্রায় সমান, অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে প্রায় তিন লক্ষ কিলোমিটার। যত শক্তিশালী দূরবিনই বানাই না কেন, যারা আলোর বেগে পৌঁছে গিয়েছে তাদের আমরা কোনও দিনই জানতে পারব না, কারণ তাদের আলো বা রেডিও তরঙ্গ কখনও পৃথিবীতে পৌঁছাবে না—ঐ দূরত্বকে বলা চলে আমাদের মহাজাগতিক দিগন্ত। হিসাবে দেখা যায় এই সীমা সব দিকে ১২৫০ আলোকবর্ষ (এক বছরে আলো যত দূরে যায় তা এক আলোকবর্ষ)। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অনুমান যে এই গোচর বিশ্বে অন্তত ১০০,০০০,০০০,০০০ নীহারিকা আছে, অনেক বেশীও হতে পারে। আর নীহারিকায় তারার সংখ্যা ছোটগুলিতে হয়তো ১০০০ কোটি, বড়গুলিতে ৫০০,০০০ কোটি পর্যন্ত। তবু মহাকাশ এতই বিস্তীর্ণ যে তার অধিকাংশ প্রায় বস্তুশূন্য, মাঝে অতি সূক্ষ্ম গ্যাস ও ধূলির মেঘ ছাড়া। আলোর বেগে ছুটলেও নিকটতম তারায় পৌঁছাতে কেটে যাবে চার বছর চার মাস। এর থেকে অনুমান করা যায় বিশ্ব কত বিশাল এবং তার মধ্যে আমাদের এই গ্রহটি কত নগণ্য।

সহস্র কোটি বছর কি তারও আগে প্রসারণরত আদি গ্যাস জুড়িয়ে জুড়িয়ে তারায় তারায়

জড়ো হয়ে রূপ নিয়েছিল ছায়াপথ। এর মধ্যে কি করে পৃথিবী ও তার প্রতিবেশী গ্রহদের জন্ম হল সে সম্বন্ধে অনেক দিন ধরে ধারণা ছিল যে একদা আর একটি তারা সূর্যের সঙ্গে ঠোকাঠুকি খেয়েছে অথবা তার গা ঘেঁষে চলে গিয়েছে, ফলে মহাকর্ষীয় টানে কিছু তারা বস্তু বেরিয়ে আসে, তাই জমে গ্রহদের সৃষ্টি। কিন্তু এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে আপত্তি ছিল, যথা দুই তারার অতটা নিকট সংযোগ অতীব দুঃসম্ভব ঘটনা। ১৯৩০ দশক থেকে আর একটি তত্ত্ব গড়ে ওঠে যা এখন সুপ্রতিষ্ঠিত, এতে বলে যে সূর্য ও তার গ্রহ পরিবার প্রায় একই সঙ্গে গড়ে উঠেছে মহাকাশের গ্যাস ও ধূলি কণা জমে জমে তার এক বিশাল ঘূর্ণিপাকের মধ্যে ; অর্থাৎ পৃথিবী উত্তপ্ত তারার গ্যাস থেকে জন্ম নেয় নি, তার দেহের উপাদান মহাকাশে বিস্তৃত শীতল বস্তু। আকাশে যত তারা, যত গ্রহ তাদের এই একই ইতি-

চিত্র ১। সূর্য ও তার গ্রহ পরিবারের জন্ম।
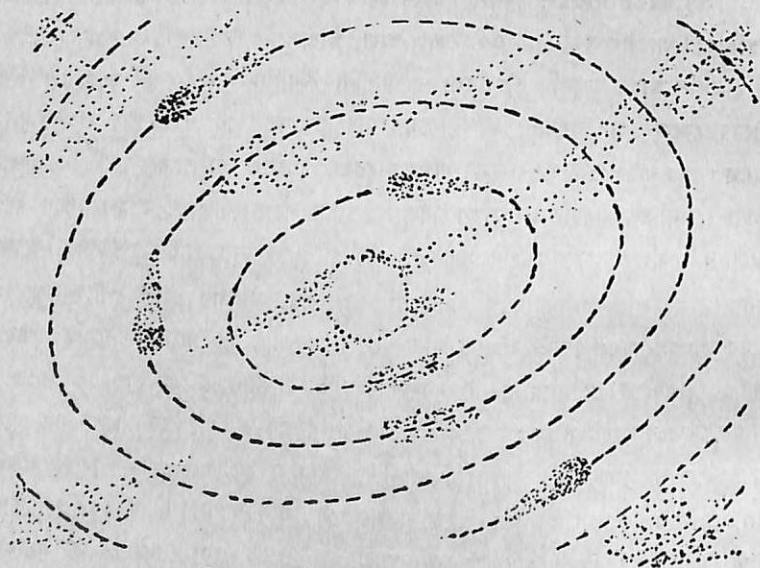
হাস এবং এই ভাবে এখনও এরা জন্ম নিচ্ছে। সব তারার অবশ্য গ্রহ নেই, কিন্তু এই তত্ত্বের ফলে গ্রহের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে গেল, কারণ দুই তারার সংযোগ আর দরকার হল না।

সাধারণত ধরা হয় পৃথিবী মূর্তি নিয়েছে প্রায় ৫০০ কোটি বছর আগে, এবং শৈশব কালে তার দেহ খুব উত্তপ্ত ছিল, সম্ভবত গলে তরল হয়ে গিয়েছিল। জ্বলন্ত তারা বস্তুর বদলে

যদি শীতল গ্যাস ও ধূলির থেকে তার জন্ম হয়ে থাকে তবে এই তাপ এল কোথা থেকে ? বিজ্ঞানীরা বলেন তাপের উৎপত্তি পৃথিবীরই জঠরে, ইউরেনিয়াম প্রমুখ তেজস্ক্রিয় পদার্থের স্বাভাবিক ক্ষয় থেকে। নক্ষত্ররা আরও ভারী ও বড় বলে তাদের গর্ভে অতিরিক্ত তাপ জনন হয় পরমাণু ভাঙা গড়ার থেকে, প্রথমে হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম (এই প্রক্রিয়ার তেজ কাজে লাগানো হয়েছে হাইড্রোজেন বোমায়), তার পর আরও ভারী মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি হয়, ঐ নিদারুণ তাপে সব বস্তু গ্যাস হয়ে যায়। তারা ও গ্রহের, সূর্য ও পৃথিবীর বিবর্তনে এই মৌলিক পার্থক্য।

সেই প্রাথমিক পৃথিবীর মূর্তিটা কল্পনা করলে দেখব তাতে অবিরাম বিক্ষোভ ও আলোড়ন—ভিতরে জঠর জ্বালা, পাহাড় ফেটে কালো ধোঁয়া পাকিয়ে উঠছে, আগ্নেয়-গিরির রক্তিম জিহ্বা আকাশ লেহন করছে আর তার মুখ উদ্‌গার করছে লোহিত লাভা (গলিত শিলা), কখনও তা ফোয়ারার মত লাফিয়ে উঠে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে ; মাঝে মাঝে ভূমিকম্পের গর্জন, উপর থেকে অবিরত ঝরছে উলকা, তাদের আঘাত পৃথিবীর গা খুবলে দিচ্ছে বসন্ত রোগীর মত—আর আকাশে তরুণ অরুণের জ্বলন্ত দৃষ্টি। তাকে প্রদক্ষিণ করতে করতে যুগ যুগ ধরে ধীরে ধীরে জুড়াল পৃথিবী, গায়ে লাগল বৃষ্টির শীতল পরশ। আজ তার গর্ভে তেজস্ক্রিয় পদার্থ অনেক ক্ষয়ে গিয়েছে, তবু দেহ তাপের অধিকাংশ আসছে ঐ উৎস থেকে।

প্রথমে পৃথিবীর বয়স মাপবার চেষ্টা হয়েছিল কতগুলি পরোক্ষ উপায়ে, যেমন সাগরের জলে নুনের পরিমাণ থেকে, পরে আরও প্রত্যক্ষ ও নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি পাওয়া গেল পাথরে তেজস্ক্রিয় (radioactive) পদার্থের ক্ষয়ে। এই সব অস্থায়ী পদার্থের পরমাণুগুলি বিশেষ বিশেষ হারে অন্য পদার্থে পরিণত হয় ; যথা ইউরেনিয়াম বা থোরিয়াম থেকে সীসা, পটাসিয়াম থেকে আর্গন। জানা আছে ইউরেনিয়ামের যে আইসোটোপটির আণবিক ভার ২৩৮ তার অর্ধেক ক্ষয় হতে লাগে ৪৫০ কোটি বছর (আইসোটোপ হল আণবিক ভারের সামান্য তারতম্য জনিত একই মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন রূপ)। তেজী থোরিয়ামের অর্ধায়ু এর চেয়ে বেশী, পটাসিয়ামের কম। সুতরাং তেজস্ক্রিয়া মেপে ক্ষয়িষ্ণু আইসোটোপের কতটা বাকি আছে তা হিসাব করা যায় এবং তার থেকে আদি বস্তুটির বয়স। অনেক পাথরেই কিছু কিছু ইউরেনিয়াম আছে, সেই ঘড়ি জানায় পাথরের বয়স। তেমনি প্রাচীন মানুষের ইতিহাস অনুধাবনে তেজস্ক্রিয় কারবন বিশেষ কাজে লাগে।

এ যাবৎ প্রাচীনতম পাথর গ্রীনল্যান্ডে পাওয়া গিয়েছে যার বয়স প্রায় ৩৭৬ কোটি বছর, আফ্রিকার ট্যানজানিয়াতে আছে ৩৫০ কোটি বছর বৃদ্ধ শিলা। সম্ভবত আরও

পুরনোগুলি প্রাকৃতিক প্রভাবে ক্ষয়ে গিয়েছে। অনেকের ধারণা উলকার জন্মও সৌর জগতের সৃষ্টির সঙ্গে, ১৯৭৭ সালে তেজস্ক্রিয়ার ঘড়িতে জানা যায় অ্যালেন্ডে উলকার বয়স ৪৫৪ কোটি বছর। অতলান্তিক মহাসাগরের মাঝামাঝি এক নিমজ্জিত পাহাড় আছে, তার শিলাও নাকি ৪৫০ কোটি বছরের প্রাচীন। পৃথিবীর ত্বক যখন জমে কঠিন হয়েছিল তখন থেকে তার বয়স ধরা হয় ৪৬০ কোটি বছর।*

বাইবেলে আদমের বংশধরদের যে তালিকা আছে তাদের আয়ু যোগ করে ১৬৫০ সালে ধর্মযাজক জেম্‌স আশার ঘোষণা করেন যে পৃথিবীর সৃষ্টি ৪০০৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। তখন অবশ্য বিচিত্র প্রাণী কুলের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা ছিল না। এই ইতিহাস যত প্রকাশ পেতে লাগল তত বোঝা গেল উপরোক্ত বয়স কত অসম্ভব।

বিশ্ব ও পৃথিবীর জন্মের পর প্রাণের অপেক্ষা। প্রাণ সৃষ্টির অলৌকিক ঘটনা ঠিক কোন পথে সম্ভব হয়েছিল তা আজও অস্পষ্ট। এই রহস্যের মুখোমুখি হয়ে কেউ কেউ ভেবেছে যে প্রাণবীজ প্রথমে এখানে এসেছে মহাকাশ থেকে, উলকাকে বাহন করে। কল্পনাপ্রবণ লোকেরা এমন কথাও ভাবতে আরম্ভ করেছে যে আজ পৃথিবীবাসীরা যেমন দিক বিদিকে রকেট পাঠাচ্ছে এই রকম কোনও বাহন যোগে গ্রহান্তর থেকে জীবাণু প্রথম পৌঁছে থাকতে পারে পৃথিবীতে। কিন্তু এই সম্ভাবনার বিচার করতে আগে প্রাণ বলতে কি বোঝায় তার আলোচনা দরকার।

জীববিজ্ঞানীরা ধরতে পেরেছেন যে নিউক্লিইক অ্যাসিড নামক এক শ্রেণীর বস্তুর মধ্যেই প্রাণের চাবিকাঠি, কারণ এর এক আশ্চর্য ক্ষমতা আছে নিজেকে বহুগুণিত করবার বা বাড়িয়ে চলবার—যা প্রাণী মাত্রেরই বৈশিষ্ট্য। এই নিউক্লিইক অ্যাসিড আছে সব জীবের প্রতি দেহকোষের কেন্দ্রে, সেখানে যে বংশকণিকা জীবের আকৃতি প্রকৃতির অনেক কিছু নিয়মন করে নিউক্লিইক অ্যাসিড তারই উপাদান।

প্রাণের আর একটি আবশ্যিক বস্তু প্রোটিন। প্রোটিনের নানা রূপ, দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশে তারা ভিন্ন ভিন্ন কাজ সম্পন্ন করে—কোথাও তারা দেহ গঠনের উপাদান, কোথাও এন্‌জাইম রূপে সাহায্য করছে প্রাণ ধারণের জন্য যে নানাবিধ পদার্থের প্রয়োজন তা বানাতে। প্রোটিনের দীর্ঘ অণু ক্ষুদ্রতর বস্তু অ্যামিনো অ্যাসিড গেঁথে গেঁথে তৈরি হয়, এই রকম অ্যামিনো অ্যাসিড আছে কুড়িটা। সুতরাং বিভিন্ন রূপে তাদের সাজিয়ে প্রকৃতি

* লেখকের 'বিশ্ব বিচিত্র' গ্রন্থে মহাকাশ, বিশ্ব, বিবিধ জ্যোতিষ্ক, পৃথিবী ইত্যাদির কাহিনী বিশদ ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

বহুসংখ্যক বিভিন্ন প্রোটিন সৃষ্টি করতে পারে।

নিউক্লিইক অ্যাসিড ও প্রোটিন গঠনে যে কয়েকটি মৌলিক পদার্থ লাগে তার মধ্যে প্রধান হল কারবন, কারণ তার পরমাণু পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে লম্বা মালা বানাতে পারে। এই গুণটি না থাকলে নিউক্লিইক অ্যাসিড ও প্রোটিনের মত সুদীর্ঘ ও জটিল অণু এবং অন্যান্য অনেক জৈব বস্তু তৈরি সম্ভব হত না। সুতরাং বলা চলে পার্থিব প্রাণের ভিত হল কারবন।

এই প্রাণ পৃথিবীর বাইরে সৃষ্টি হয়ে পরে এখানে এসেছে কিনা তার বিচারে রোমাঞ্চক কল্পনা ছাড়াও বাস্তব তথ্য সংগ্রহ করেছেন বিজ্ঞানীরা। গত কয়েক বছর ধরে তাঁদের বর্ণালীযন্ত্র মহাকাশের মুক্ত গ্যাসে একের পর এক জটিল থেকে জটিলতর রাসায়নিক বস্তু সনাক্ত করে চলেছে, তাদের সংখ্যা এখন পঞ্চাশেরও বেশী, অধিকাংশই কারবনযুক্ত জৈব বস্তু; এক একটি এগারোটি পর্যন্ত পরমাণুর যৌগিক পদার্থ। মহাকাশের একটি বস্তু অ্যালকহল, যার থেকে মদের নেশা; মহাজাগতিক গ্যাসে আছে হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড, তা আমাদের পক্ষে পরম বিষ হলেও পরীক্ষাগারে অতিবেগনি (ultraviolet) রশ্মির সাহায্যে তার থেকে পিউরিন জাতীয় পদার্থ তৈরি হয়েছে, তা নিউক্লিইক অ্যাসিডের অংশ। মহাকাশে অতিবেগনি রশ্মির অভাব নেই, সূর্য থেকেই আমরা তা পাই। তদু-পরি যখন উলকা খণ্ডে পিউরিন এবং অ্যামিনো অ্যাসিডেও পাওয়া গেল, তখন অপার্থিব প্রাণের জল্পনা আরও জমে উঠল। উলকার উৎপত্তি সম্বন্ধে এক মতবাদ হল যে বৃহত্তর পূর্ণাঙ্গ কোনও গ্রহ ভেঙে তাদের সৃষ্টি, সুতরাং উপরোক্ত নজির থেকে কেউ কেউ ভাবছেন যে হয়তো সেই গ্রহে প্রাণী ছিল।

১৯৭৭ সালে ফ্রেড হয়েল ও চন্দ্র ভিক্রমসিংহে (এঁর দেশ সিংহল) আরও দুঃসা-হসিক কতগুলি সম্ভাবনা প্রস্তাব করেছেন। এঁরা বলেন যে হয়তো মহাজাগতিক গ্যাস-মেঘের অণুদের মধ্যে ধূলির গায়ে গায়ে রাসায়নিক জৈব ক্রিয়া শুরু হয়ে দেখা দিল প্রাথমিক জীবাণু ব্যাকটিরিয়া ও ভাইরাস, তারা ধূমকেতু ভর করে এসে পৃথিবীতে প্রাণ পত্তন করল। শুধু তাই নয়, ধূমকেতুর আবির্ভাবই এখানে মাঝে মাঝে ইনফ্লুএন্জা ও ও অন্যান্য রোগের মহামারী সৃষ্টি করেছে, এদের বাহন হল ঐ আকস্মিক আগন্তুকের বর্জিত ধূলি ও উলকা কণা। ধূমকেতু যে দুর্নিমিত্ত ও দুর্ঘটনার অগ্রদূত এই প্রাচীন বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি পাই হয়েল এবং তাঁর সহকর্মীর তত্ত্বে।

উপরন্তু এঁরা বলেন যে পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার আগেই হয়তো মহাকাশে প্রাণবীজ প্রস্তুত ছিল, সেখান থেকে তা দিকে দিকে ছড়িয়েছে, অন্যান্য তারার গ্রহেও যেখানে

উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়েছে সেখানেই ডালপালা ছড়িয়েছে, হয়তো একই উপাদানে গড়া এই প্রাণীদের চেহারা সর্বত্র অনুরূপ। অধিকাংশ বিজ্ঞানীর মধ্যে এর বিপরীত ধারণাই বেশী প্রচলিত—তাঁরা বলেন ভিন্ গ্রহের প্রাণী সম্ভবত সম্পূর্ণ ভিন্ন মসলায় ভিন্ন পারমণ্ডলে গড়া, হয়তো কারবনের বদলে সিলিকনের ভিত্তিতে—সুতরাং তাদের চেহারা কল্পনা করা যায় না। যাঁরা বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে গল্প লেখেন এতে অবশ্য তাঁদের কল্পনা আরও মুক্তি পেয়েছে, নানা রকম অদ্ভুত ও উদ্ভট প্রাণীর জন্ম দিয়েছে তাঁদের কলম।

পৃথিবী-বহিভূর্ত প্রাণের খোঁজে বিজ্ঞানও পিছিয়ে থাকে নি। যখন জানা গেল যে, গ্রহের সৃষ্টি দূরচারী তারাদের নিকট যোগাযোগের উপর নির্ভর করে না তখন থেকেই গ্রহের সম্ভাবনা অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছিল, মহাকাশে নানা জৈব বস্তুর আবিষ্কার বহির্বিশ্বে প্রাণসন্ধানীদের উৎসাহ আরও বাড়াল।

মহাকাশ বিহার সম্ভব হওয়ার পর চাঁদে গিয়ে মানুষ যে শিলা ও মাটি নিয়ে এসেছে তাতে হীনতম প্রাণীরও চিহ্ন পাওয়া যায় নি, মঙ্গল গ্রহে প্রেরিত যন্ত্রাবলী স্পষ্ট জবাব কিছু দিতে পারে নি। সূর্যের অন্যান্য গ্রহে সম্ভাবনা আরও কম। যুক্তরাষ্ট্রে ও রাশিয়ায় জোরালো রেডিও দূরবিন সৌর জগতের বাইরে দূর দূরান্তরে কান পেতেছে, আশা এই যে মহাকাশের কোনও সপ্রাণ দ্বীপ থেকে বুদ্ধিমান বাসিন্দারা এমনি অন্যান্য দ্বীপবাসীদের উদ্দেশ্যে বার্তা পাঠাচ্ছে। এ যাবৎ বিশ্বাসযোগ্য সাড়া কিছু মেলে নি। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের অনুসন্ধান নিতান্তই প্রাথমিক ও সামান্য, তার ব্যর্থতায় এমন কথা ভাববার কারণ নেই যে বহির্বিশ্ব প্রাণশূন্য। এক যুক্তিপূর্ণ অনুমান অনুসারে ছায়াপথেই ৫০০০ কোটি গ্রহ আছে। সব গ্রহ অবশ্য প্রাণের উপযুক্ত হতে পারে না, প্রাণীরও ইতর বিশেষ আছে। তারার বেশী কাছে বা বেশী দূরে থাকলে গ্রহে যথাক্রমে তাপ ও শীত হবে মারাত্মক, তা ছাড়া পৃথিবীতে প্রাণ দেখা দিয়েছে জলে, নিকট গ্রহে তা বাষ্পে ও দূর গ্রহে বরফে পরিণত হতে পারে, যেমন যথাক্রমে শুক্র ও মঙ্গলে। এই সব কারণে তারাকে ঘিরে যে কক্ষ পথে থাকলে গ্রহে প্রাণের স্ফূর্তি সম্ভব তারার চরিত্র অনুযায়ী তা অল্প বিস্তর সংকীর্ণ।

এক মার্কিন বিজ্ঞানীর সাম্প্রতিক হিসাবে তারা সূর্যের মাত্র ২০ শতাংশ হালকা হলে তাকে ঘিরে এ রকম প্রাণোপযোগী কক্ষাঞ্চল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, সূর্যের চেয়ে ২০ শতাংশ ভারী হলে তার বিকীর্ণ অবারিত অতিবেগনি রশ্মি গ্রহে কোনও স্থলচর জীব সহ্য করতে পারবে না—এবং পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান জীব মানুষ স্থলের বাসিন্দা। যে সব গ্রহে বুদ্ধিমান প্রাণীরা উন্নত বৈজ্ঞানিক সভ্যতা গড়ে তুলেছে, যাদের গ্রহান্তরের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষমতা আছে, তাদের সংখ্যা নিশ্চয় ইতর প্রাণীবাহী গ্রহের তুলনায় অনেক কম।

উপরোক্ত বিজ্ঞানীর মতে উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠতে প্রাণের শুরু থেকে অন্তত ৩০০-৪০০ কোটি বছরের নিরবচ্ছিন্ন ক্রমবিকাশ দরকার, গ্রহে প্রাণ দেখা দিলেও সর্বদা তা সম্ভব নাও হতে পারে। তথাপি ১৯৭১ সালে বিশ্বের বিশেষজ্ঞদের এক সভায় অনুমান করা হয় এই নীহারিকায় বুদ্ধিমান প্রাণীদের গঠিত বৈজ্ঞানিক সভ্যতার সংখ্যা এক থেকে ১০ লক্ষ।

বহির্জাগতিক প্রাণের জল্পনায় এখন পর্যন্ত একটি বাধা আছে। প্রায় সব অ্যামিনো অ্যাসিড দুই রকমের হয়—আণবিক বস্তু একই, শুধু গঠন বিপরীত বলে একটা যেন আর একটার প্রতিবিম্ব। রসায়নবিৎ তার কর্মশালায় কোনও এক অ্যামিনো অ্যাসিড বানালে পাবে এক মিশ্র বস্তু যাতে 'বামমুখী' ও 'দক্ষিণমুখী' দুইই আছে সমান পরিমাণে ; কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত নিয়মে পার্থিব প্রাণী দেহের স্বাভাবিক প্রোটিনে প্রায় সর্বত্র আছে শুধু 'বামমুখী' অ্যামিনো অ্যাসিড। এ যাবৎ উলকা খণ্ডে পাওয়া গিয়েছে শুধু মিশ্র অ্যামিনো অ্যাসিড। যদি কখনও কেবল একটি মেলে তবে নিশ্চয় বহির্বিশ্বে প্রাণসন্ধানের উৎসাহ আরও এক ধাক্কা বাড়বে।

অন্যত্র প্রাণের খোঁজ মিললেও অবশ্য প্রমাণ হবে না যে আমাদের প্রাণসূত্র একই। পৃথিবীর প্রাণবীজ বহিরাগত হতে পারে কিনা এ সম্বন্ধে আজ অনেক বিজ্ঞানীর মন খোলা, যদিও এখন পর্যন্ত সনাতনপন্থীদের দলটাই ভারী। তাঁদের ধারণা অনুসারে পৃথিবীর প্রাণ পৃথিবীর জলেই সৃষ্টি হয়েছে।

এ ক্ষেত্রেও দেখি প্রাচীন কবি ভাবুকদের আশ্চর্য অনুমান শক্তি। এই গ্রহের প্রাথমিক চেহারাটা যখন মানুষের কল্পনারও বাইরে ছিল তখনই অনেকে অনুমান করেন যে জলেই প্রাণেই উদ্ভব। প্রায় ২৫০০ বছর আগে অ্যানাকসিম্যানডার লিখে-ছিলেন যে প্রাণের জন্ম আদিম কাদায়। বিবিধ পুরাণে দেখা যায় আদিম পৃথিবীতে জল স্থলের ব্যবধান সৃষ্টি করে প্রাণের পথ তৈরি করাই এক প্রধান সমস্যা। ব্যাবিলনীয় উপাখ্যানে প্রথমেই দেবতারা ভাবতে বসেছে কি করে জল সরিয়ে ফলপ্রসূ মাটিকে মুক্ত করা যায়। এর কিছু কাল পরে অনতিদূরের ইহুদী কাহিনীতে বহু দেবতা পরিণত হয়েছে এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরে ; এই পুরাণ অনুসারে প্রথমে চরাচর জলমগ্ন ছিল, জল এক দিকে সরিয়ে হল সমুদ্র, তখন পৃথিবী দেখা দিল ; প্রাণের সূচনা কিন্তু স্থলেই মনে হয়—জলের প্রাণী সৃষ্টি হওয়ার আগে সেখানে নানা শ্রেণীর উদ্ভিদ (ফলগাছ পর্যন্ত) দেখা দিয়েছিল। এই পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলের বহু দূরে আমেরিকা মহাদেশের মায়া সৃষ্টি বৃত্তান্তেও শোনা যায় দৈববাণী : জল সরে গিয়ে স্থল মুক্ত হক, যাতে বসুন্ধরা কঠিন

হয়ে ফল ধরতে পারে।

এই গ্রহের মঞ্চে কেমন করে প্রাণের উন্মেষ হল এ বার তাই বিচার্য। এখন বাতাসের প্রধান গ্যাস নাইট্রোজেন ও অকসিজেন, আমরা প্রতি নিঃশ্বাসে অকসিজেন নিচ্ছি, হীনতর প্রাণী ও উদ্ভিদরাও নিচ্ছে, এই গ্যাসটি ছাড়া প্রাণের অস্তিত্ব যেন অকল্পনীয়। কিন্তু নবজাত পৃথিবীতে অকসিজেনের আবরণ ছিল না। জন্ম কালে পৃথিবী যে গ্যাসীয় পরিমণ্ডলে জড়িত ছিল, আমরা অনুমান করতে পারি হাইড্রোজেন তার মধ্যে প্রধান (সমগ্র বিশ্ব বস্তুর নয়-দশমাংশ এই গ্যাসটি), তা ছাড়া ছিল আলেয়া গ্যাস মিথেন, অ্যামোনিয়া ও জলবাষ্প, তিনটিই হাইড্রোজেন সম্বলিত। সূর্যের দূরতর ও বৃহত্তর গ্রহগুলির প্রধান উপাদান হাইড্রোজেন, মিথেন ও অ্যামোনিয়া। মঙ্গল ও শুক্র গ্রহের গ্যাস মণ্ডলে এদের বদলে আছে প্রধানত আঙ্গারিক গ্যাস (কারবন ডাই-অক্সাইড), তা ছাড়া সামান্য নাইট্রোজেন, জলবাষ্প ইত্যাদি।

সম্প্রতি অনেকে বলছেন যে পৃথিবীর আদি পরিমণ্ডল প্রধানত তার জনক গ্যাস-মেঘের অবশিষ্টাংশ নয়, গ্যাসগুলি এসেছে আগ্নেয়গিরির উদ্‌গার থেকে, এমন কথাও শোনা যায় যে সমুদ্রের জল ও বাতাসের নাইট্রোজেনও গর্ভমুক্ত গ্যাসের দান। যাই হক, এই সব গ্যাস নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন গবেষণাগারে অনেক পরীক্ষা হয়েছে এবং আগ্রহ-জনক ফল পাওয়া গিয়েছে। হাইড্রোজেন, মিথেন ও অ্যামোনিয়ার মিশ্র আবহে সূর্যের অতিবেগনি রশ্মির অনুকরণে বিদ্যুৎ স্ফুরণ করে অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে অ্যামিনো অ্যাসিডও তৈরি হয়েছে। ঐ জাতীয় গ্যাস মণ্ডলে ইলেকট্রন (পরমাণুর অন্তর্গত কণা) স্রোতের প্রভাবে পিউরিন পাওয়া গিয়েছে, তার পর অতিবেগনি রশ্মির সাহায্যে অন্যান্য ক্ষুদ্র অণু জুড়ে নিউক্লিইক অ্যাসিডের মৌলিক খণ্ডটি সৃষ্টি হয়েছে যা গেঁথে গেঁথে মালার মত তার সম্পূর্ণ অণুটি তৈরি হয়। এ সব রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে যে তেজ বা এনার্জির প্রয়োজন, আকাশে তা ছিল বিদ্যুৎ স্ফুরণে, অতিবেগনি বিকিরণে, তা ছাড়া ছিল পৃথিবীর স্বকীয় তেজস্ক্রিয়া ও তাপ। আমরা আগে দেখেছি একই প্রাকৃতিক পথে মহাকাশের নানা পদার্থের সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে।

আঙ্গারিক গ্যাস, নাইট্রোজেন এবং জলবাষ্প থেকেও গবেষণাগারে সম্প্রতি অনুরূপ উপায়ে জটিল জৈব অণু সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে এবং কেউ কেউ বলছেন পৃথিবীর আদিম আবহ বরং প্রতিবেশী গ্রহ মঙ্গল ও শুক্রের মতই ছিল, হাইড্রোজেন এবং হাইড্রোজেন-যুক্ত গ্যাসগুলি বেশী ছিল না। তা ছাড়া রকেটে যন্ত্র পাঠিয়ে এই দুই গ্রহে প্রাণের চিহ্ন পাওয়া যায় নি, জৈব প্রক্রিয়া বিনাও যদি সেখানে আঙ্গারিক গ্যাস ও

নাইট্রোজেন থাকতে পারে তবে আদিম নিষ্প্রাণ পৃথিবীতেই বা নয় কেন ? কিন্তু উপরোক্ত হাইড্রোজেন-যুক্ত গ্যাসগুলির থেকে সূর্য রশ্মির প্রভাবেও আঙ্গারিক গ্যাস ও নাইট্রোজেনের সৃষ্টি সম্ভব। যাই হক, অনুমান করা চলে যে সহজ থেকে জটিলতর অণুর ধাপে ধাপে জৈব ক্রিয়া এগিয়ে চলল, পিউরিন ও অন্যান্য আবশ্যিক বস্তু থেকে নিউক্লিইক অ্যাসিড, অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে প্রোটিন ইত্যাদি প্রাণের প্রাথমিক উপাদান তৈরি হল। অধিকাংশের মতে বৃষ্টির জলে পৃথিবীর নিচু অংশগুলি ভরে দেখা দিয়েছিল সাগর, তার উষ্ণ জলে আবহের বিভিন্ন গ্যাস এবং তাদের সংযোগজাত বৃহত্তর বস্তুর অণুগুলি গুলে ছিল। একদা এদের রাসায়নিক ক্রিয়ায় তৈরি হল নিউক্লিইক অ্যাসিডের অংশ, তার পর তার সম্পূর্ণ অণু—অর্থাৎ বংশকণিকা বা জিন (gene)। তখন সেই অণু লম্বালম্বি দু ভাগ হয়ে দ্বিগুণ হল, এ ভাবে তা বেড়ে চলল, অর্থাৎ প্রথম প্রাণের অঙ্কুর দেখা দিল মুক্ত বংশকণিকা রূপে। আজ হরগোবিন্দ খোরানা ও অন্যান্যরা ক্রমশ বৃহত্তর কৃত্রিম নিউক্লিইক অ্যাসিড বানাচ্ছেন গবেষণাগারে, এগুলির ক্রিয়াকলাপ স্বাভাবিক বংশ-কণিকার অনুরূপ।

ভাইরাস নামটা আমরা সবাই শুনেছি, এদের ভয় করে থাকি কারণ এরা সর্দি, বসন্ত ও আরও নানা রোগের সৃষ্টি করে। ছোট জাতের ভাইরাস দশ হাজারটিকে এক মিলি-মিটারের মধ্যে পাশাপাশি বসানো চলে। আশ্চর্য এই যে কোনও রকম জীবের সংসর্গ ছাড়া এরা বাড়ে না, তখন এরা নির্জীব ও নিষ্ক্রিয়। সুতরাং কেউ বলেন ভাইরাসের স্থান সপ্রাণ ও নিষ্প্রাণের সন্ধি স্থলে, কেউ তাদের জীব বলেই ভাবেন। ভাইরাসেরও প্রাণবস্তুটি নিউক্লিইক অ্যাসিড, তবে সাধারণত তাতে প্রোটিনের একটি খোলস থাকে। অর্থাৎ এদের আবির্ভাব কালে অ্যামিনো অ্যাসিড জুড়ে জুড়ে প্রোটিন তৈরি হয়ে গিয়েছে।

যাদের নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণ জীব বলা চলে আকারে আণুবীক্ষণিক হলেও তারা আরও জটিল। এই ব্যাকটিরিয়া জাতের জীবাণুরা একটি মাত্র কোষে আবদ্ধ, সেই কোষের দেয়াল আছে, ভিতরে বংশকণিকা ছাড়া খাদ্য বস্তু ইত্যাদিও আছে। বংশকণিকার সঙ্গে সম্পূর্ণ কোষ বারে বারে দ্বিভক্ত হয়ে এরা বহুগুণিত হয়েছে। এখন অনেকের ধারণা ভাইরাস থেকে ব্যাকটিরিয়ার উদ্ভব হয় নি, হয় এর বিপরীতটাই ঘটেছে, নয়তো তারা পৃথক ভাবে গড়ে উঠেছে নিউক্লিইক অ্যাসিড থেকে। কোষ-প্রাচীর কি ভাবে সৃষ্টি হল সে সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হয়েছে, যদিও এখনও তা খুব স্পষ্ট নয়। অগ্রগতির এই ধাপটি অতি গুরুতর, কারণ এতে সম্ভব হয়েছে বহুকোষ জীবের আবির্ভাব—শেষ পর্যন্ত মানুষের। আমাদের শরীরে এখনও আদিম সাগর বর্তমান, রক্তে ও দেহকোষে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্লোরিন

ম্যাগ্নেসিয়াম ও অন্যান্য আবশ্যক মৌলিক পদার্থ সেই সাগরে যেমন ছিল ঠিক সেই পরিমাণে আছে।

প্রাথমিক ব্যাকটিরিয়া যখন দেখা দিল সাগরে, জলের উপরে আবরণ তাদের রক্ষা করেছে মারাত্মক অতিবেগনি রশ্মি থেকে। অকসিজেন দরকার ছিল না তাদের, অনেকের পক্ষেই তা বরং বিষ, অথচ এ 'অবায়ুজীবী' জীবাণুরাই প্রথম সৃষ্টি করল অকসিজেন। তার থেকে হল ওজোন গ্যাস যা আকাশে অতিবেগনি রশ্মির অধিকাংশ আটকাল, এখনও আটকাচ্ছে। জীব জগৎ জল থেকে স্থলে বিস্তৃত হতে তখন আর বাধা রইল না। অক-সিজেন পেয়ে পৃথিবীর হাটে শুরু হল এই বিচিত্র প্রাণের মেলা।

কবে বন্ধ্যা বসুন্ধরার কোলে প্রথম পুরাজীবাণু দেখা দিয়ে প্রাণের সাড়া জাগাল, নানা দেশে তার খোঁজ হয়েছে এবং নতুন আবিষ্কারের ফলে ক্রমশ সেই তারিখটি পিছিয়ে যাচ্ছে। মনে রাখতে হবে যে পরে পৃথিবীর গায়ে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, যা ছিল জলমগ্ন কোথাও তা উপরে মাথা তুলেছে, কোথাও স্থল তলিয়ে সাগর হয়েছে। এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাক-টিরিয়ার অস্থিহীন কোমল দেহের অবশিষ্টাংশ খুঁজে পাওয়া সহজ নয়, কিন্তু কোথাও কোথাও তারা ধরা পড়েছে; যদিও কোনও কোনও ক্ষেত্রে পাথরের গায়ে শুধু ছাপটুকু রেখে গিয়েছে তারা, কোথাও বা শুধু জৈব অণু পাওয়া গিয়েছে, আর কোথাও চিহ্ন নেই। আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা মহাদেশে ২০০ কোটি বছরের বেশী প্রাচীন জীবাণুর নজির আবিষ্কারের দাবি শোনা গিয়েছে। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় ৩৫০ কোটি বছর প্রাচীন ব্যাকটিরিয়ার মত জীবাণুর ফসিল বা জীবাশ্ম (আক্ষরিক অর্থে প্রস্তরীভূত জীব) প্রাপ্তির খবর প্রকাশিত হয় ১৯৮০ সালের মাঝামাঝি।

১৯৭৭ সালে মার্কিন বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় যে ফসিল পাওয়া গিয়েছে এ যাবৎ তা প্রাচীনতম। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অনুসন্ধানী দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্স্ভাল প্রদেশ থেকে প্রাচীন শিলা সংগ্রহ করে এনে খুব পাতলা করে কাটলেন, অণুবীক্ষণের নিচে তার মধ্যে দেখা গেল নানা রকমের কোষ—লম্বা ও পাতলা, কোঁকড়ানো, ভাঁজকরা বা চ্যাপটা। শুধু তাই নয়, এদের এক-চতুর্থাংশ দ্বিভক্ত হয়ে বংশবৃদ্ধি করছিল যখন এ পাথর তৈরি হয়েছে। পাথরের বয়স ৩৫০ কোটি বছর (ইতিপূর্বে অনুরূপ জীবাণুর জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছে অনেক পরবর্তী পাথরে)। তা হলে পৃথিবীর বয়স ১০০ কোটি বছর পূর্ণ হতে হতেই জীবাণু জগতে কিছুটা বৈচিত্র্য এসে গিয়েছে। উপরন্তু এই প্রাচীনতমদের চেহারা দেখে আবিষ্কর্তারা বলছেন যে যে সব ব্যাকটিরিয়া এবং নীল-সবুজ শেওলা (algae) দেহস্থ ক্লরফিলের সাহায্যে আঙ্গারিক গ্যাস ও সূর্যালোক থেকে চিনি জাতীয় খাদ্য ও
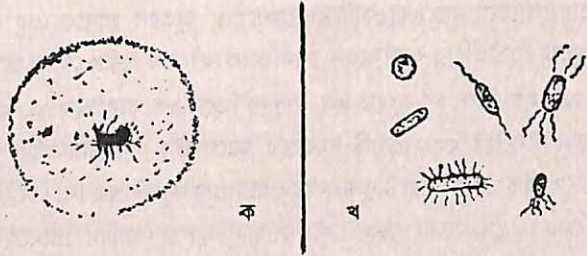
চিত্র ২। আদিতম জীব (বহু গুণ বর্ধিত রূপ)। ক—এককোষ নীল-সবুজ শেওলা, সম্ভবত ২০০ কোটি বছর প্রাচীন ফসিল, ক্যানাডায় প্রাপ্ত। খ—নানা জাতের ব্যাক্‌টিরিয়া।

অক্সিজেন বানায় এরা সেই শ্রেণীর। যদি তাই হয় তা হলে ৩৫০ কোটি বছর আগেই পৃথিবীর বাতাসে অক্সিজেন জমা হচ্ছিল। এতে উচ্চতর প্রাণী আবির্ভাবের পথ পরিষ্কার হল। সামান্য কয়েক শ্রেণীর জীবাণু ছাড়া এখন সব উদ্ভিদই অক্সিজেন সৃষ্টি করছে।

এই ফোটোসিন্‌থেসিস প্রক্রিয়া যদি ৩৫০ কোটি বছর আগেই প্রচলিত থাকে তবে তারও আগে এসেছে একেবারে প্রথম যুগের জীবাণু অক্সিজেন যাদের অসহ্য। এ রকম অবায়ুজীবী ব্যাকটিরিয়া এখনও আছে, বায়ুহীন আঁধার আনাচে কানাচে তাদের বাস, বায়ুর সংস্পর্শে বৃদ্ধি পায় না, কেউ কেউ মরেই যায়। যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েলোস্টোন জাতীয় উদ্যানে মাটি ভেদ করে উঠছে উষ্ণ জলের ফোয়ারা, জলের তাপ ৬৫-৭০ ডিগ্রি সেন্‌টিগ্রেড, তাতে এক দল অবায়ুজীবী জীবাণু সুখে বাস করে। পরীক্ষা করে জীববিজ্ঞানীরা বলেছেন পৃথিবীর প্রথম ১০০ কোটি বছরে যারা দেখা দিয়েছিল তাদের তুলনায় 'এই সজীব ফসিল' প্রায় অপরিবর্তিত।

প্রথম অবায়ুজীবী জীবাণুরা স্যগর জলে তৈরী খাদ্য পেয়েছে, কিন্তু প্রকৃতি নতুন নতুন পথ না খুললে এক দিন তা ফুরিয়ে প্রাণ বাতিও নিভে যেত। এই অবায়ুজীবীদের পুষ্টির উচ্ছিষ্ট বস্তু আঙ্গারিক গ্যাস, তার থেকে সম্ভব হল ক্লরফিল-সম্বলিত নতুন জীবদের সূচনা, ঐ গ্যাস থেকে তারা নিজেরাই বানাতে শিখল অফুরন্ত খাদ্য। এই প্রক্রিয়ার বর্জিত অক্সিজেন যুগ যুগ ধরে জলে মিশল, ফলে অনেক আদি অবায়ুজীবী মারা পড়ল, তার পর আবার বহু যুগ ধরে তা বাতাসে জমল, তাতে প্রাণের সুযোগ সম্ভাবনা যে কত দূর বেড়েছে তা পরে দেখা যাবে। আমরা যাদের সূত্র ধরে এসেছি, পৃথিবীর

ইতিহাসে এই বায়ুজীবী প্রাণীরা অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক, অনেকে বলেন অক্সিজেন বাতাসে বর্তমান মাত্রায় পৌঁছেছে মাত্র ৫০ কোটি বছর আগে। সুতরাং প্রাণকে এক বার বাঁচিয়েছে আঙ্গারিক গ্যাস, দ্বিতীয় বার অক্সিজেন গ্যাস তাকে হীনতম পর্যায় থেকে ঊর্ধ্বে তুলেছে—তা ভাবলে মনে হয় আজকের জগতে এই প্রাণীর ভিড় এক আকস্মিক ও আশ্চর্য ব্যাপার।

তা হলে মনে হয় ৩৫০ কোটি বছরেরও আগে উষ্ণ পৃথিবীর জলে প্রাণের উন্মেষ ঘটেছিল। সম্ভবত তার পর নতুন করে আর প্রাণ সৃষ্টি হয় নি, ক্রমে সেই অঙ্কুর ছড়িয়েছে সর্বত্র। সে দিন থেকে সেই সামান্য অদৃশ্য আদিম প্রাণেরই জটিল থেকে জটিলতর অভিব্যক্তি ঘটে চলেছে কোটি কোটি বছর ধরে পৃথিবীর লীলাক্ষেত্রে। সেই ক্ষীণ আদি সূত্র ধরে যুগ যুগ পরে আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ, মহাকাশ বিহার—ও হাইড্রোজেন বোমা! এখনও এই সূত্র পাক খুলে এগিয়ে চলেছে ক্রমবিকাশের পথ ধরে, যে পথে অপেক্ষারত ভাবী কালের কত অজানা নতুন প্রাণী।

২। প্রাণের মেলায় প্রকৃতির বাছাই

বন্ধ্যা বসুন্ধরার কোলে প্রাণ সৃষ্টির পর ধীরে ধীরে শুরু হল বিচিত্র জীবের মিছিল। একটিমাত্র আণুবীক্ষণিক কোষকে আশ্রয় করে যার আগমন ক্রমে তারই পরিণতি অতিকায় তিমি ও ডাইনোসরে। এক দিকে বহুবিধ উদ্ভিদ, অন্য দিকে কত ছোট বড় স্থলচর, জলচর, উভচর, আকাশচর জন্তুর মধ্য দিয়ে প্রাণ শক্তি এগিয়ে চলল—মানুষের চোখে তারা কেউ সুন্দর, কেউ ভীতিকর, কেউ বা অদ্ভুত। তাদের অনেকে আজ সম্পূর্ণ লুপ্ত, কেউ রেখে গিয়েছে শুধু কয়েকটি কঙ্কালের বা তার অংশ মাত্রের সাক্ষী, কেউ বা শুধু দেহের ছাপ পাথরের গায়ে। কেউ বা তাও না, তাদের খবর হয়তো কোনও দিনই জানব না আমরা।

কেন এরা এমন করে বিদায় নিল চির দিনের মত? কেউ হার মানল অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায়, কারও শত্রু হয়ে দাঁড়াল বিরুদ্ধ প্রকৃতি—তার পরিবর্তনের ফলে জীবন সংগ্রাম অতি কঠিন হয়ে উঠল। শত্রুর থেকে আত্মরক্ষার জন্য যে গজিয়েছিল ভারী খোলস সে দেখলে তার চেয়ে বরং বেশী দরকার ছিল 'যঃ পলায়তি স জীবতি' এই নীতি অনুসারে পায়ের জোর আর হালকা দেহ। কিন্তু ক্রমবিকাশের একমুখী রাস্তা থেকে ফিরে আসা যায় না, সুতরাং অত্যধিক বিশেষত্ব অর্জনের অন্ধ গলিতে মারা পড়ল অনেকে। যারা এ ধরনের ভুল এড়িয়েছে অথবা ভাগ্যের জোরে প্রকৃতির খেয়াল খুশির, অর্থাৎ ভৌগোলিক পরিবেশ ও আবহাওয়ার আনুকূল্য পেয়েছে তারা বেঁচে রইল।

এই বিচিত্র মেলার সঙ্গে পরিচয় করা অথবা কি করে এই মিছিল গড়ে উঠল সেই সূত্রের অনুধাবন অতি রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা, কিন্তু তার আগে ঐতিহাসিক পটভূমির একটা ছক চোখের সামনে রাখলে পরিপ্রেক্ষিতের ধারণা সহজ হবে। তা ছাড়া প্রাণের ক্রমবিকাশ ও নতুন প্রাণীর আবির্ভাব কি ভাবে ঘটে সে সম্বন্ধেও দু কথা বলে নেওয়া দরকার।

আজ পৃথিবীর যে মানচিত্র আমাদের পরিচিত তা চির কালের নয়; যুগে যুগে তার অদল বদল হয়েছে। পৃথিবী শক্ত হয়ে জমার পর থেকে আজ পর্যন্ত তার উপর অনেকগুলি ছোট বড় ভৌগোলিক পরিবর্তন ঘটেছে। স্থল তলিয়ে গিয়েছে জলের নিচে, আবার জল

ফু'ড়ে পাহাড় মাথা তুলেছে ; মাত্র সাড়ে সাত কোটি বছর আগেও এই আকাশচুম্বী হিমালয় ছিল সাগরগর্ভে, আল্প্স পর্বতের বয়স দেড় কোটি বছর। পৃথিবীর গর্ভে যেন আছে এক বন্দী দানব, কিছু কাল পর পর সে দাপাদাপি আরম্ভ করে, বসুন্ধরার ত্বক জায়গায় জায়গায় ফুলে ওঠে তার দাপটে, স্থল মাথা তোলার ফলে জল গিয়ে জমে শুধু গভীর সমুদ্রে। এই সব বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে আবহাওয়ারও নানা রকম অদল বদল হয়। তার পর ব্যর্থ দানব আবার বসে বসে দম নেয়—ক্রমশ, কোটি কোটি বছর ধরে আবার পৃথিবীর গা সমতল হয়ে আসে, বৃষ্টিতে পাহাড় ক্ষয়ে যায়, সেই পলি এসে জমে সমুদ্রগর্ভে, ঠেলে তোলে জল, তা আবার গ্রাস করে স্থল—আবহাওয়া নরম হয়ে আসে, যত দিন না জেগে ওঠে দানব। বিগত ৬০ কোটি বছরের মধ্যে আজ পর্যন্ত এই গোছের বড় বিপ্লব পৃথিবীকে গ্রাস করেছে তিন বার, এই তিনটি মহাবিপ্লবের মধ্যে ভূবিজ্ঞানীরা আবার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ছোট বিপ্লবের নির্দেশ পেয়েছেন।

তা ছাড়া বার কয়েক মেরু দেশ থেকে বরফ ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে, পাহাড় থেকে হিমবাহ (glacier) গড়িয়ে নামতে নামতে পৃথিবীর গা ঘষে ক্ষত বিক্ষত করেছে। বহু সহস্র বছর শীতে অসাড় থেকে বসুন্ধরা ধীরে ধীরে মুক্তি পেয়েছে যখন এই তুষার সরে গিয়েছে পাহাড়ের মাথায় ও মেরু অঞ্চলে। বিগত ১০ লক্ষ বছরে এ রকম বৃহৎ তুষার যুগ এসেছে চার বার। চতুর্থটির সমাপ্তি মাত্র হাজার দশেক বছর আগে। জীব ও মানুষের ইতিহাসে এই সব তুষার যুগের বিশেষ গুরুত্ব, যদিও কেন পৃথিবীর তাপ কমল তা এখনও অনেকটা রহস্যাবৃত। যুগোস্লাভিয়ার বিশেষজ্ঞ মিলুটিন মিলাংকোভিচ্ যুক্তি দেখিয়েছেন যে হিমানী আসে সূর্য প্রদক্ষিণের পথে আমাদের এই গ্রহের চাল চলন থেকে, তার অক্ষের নতি ও কাঁপনে এবং কক্ষের আকারে নিয়মিত পরিবর্তনের প্রভাবে। হিসাবেও দেখা যায় ঐ সময়ের মধ্যে চার বার দীর্ঘ কাল ধরে পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়েছে, তুষার যুগের তা অন্তত আংশিক কারণ। বিকল্প তত্ত্বেরও অভাব নেই, যথা সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে মহাজাগতিক ধূলি এসে পড়াতে এই গ্রহ সৌর কিরণ পেয়েছে কম, যেমন আগ্নেয়-গিরির উৎক্ষিপ্ত ভস্ম আকাশ ঢাকলে কিছু কালের মত তাপ কমে ; ১৮৮৩ সালে ক্রাকাটোআ গিরির স্ফুরণের পর স্থানে স্থানে অস্বাভাবিক শীত পড়েছিল। সম্প্রতি হয়েল ও ভিক্রমসিংহে বলেছেন অতীতে ধূমকেতুর পরিত্যক্ত ধূলির পর্দা এ ভাবে পৃথিবীকে হিমানী মণ্ডিত করেছে। আবার অনেকের ধারণা সূর্যই মাঝে মাঝে নিস্তেজ হয়েছে ; প্রতি ১১ বছরের চক্রে যখন তার গায়ে কতগুলি দাগ দেখা দেয়, বিশাল বহ্নি শিখা উৎক্ষেপ করে সে, তখন বিকিরণও বাড়ে, আবার ঝঞ্ঝা ও আলোড়ন শান্ত হলে তেজ কমে, তেমনি

আরও দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন তুষার যুগের কারণ হতে পারে।

পৃথিবীর বিবর্তন সম্বন্ধে আর একটি তত্ত্ব উল্লেখ করা দরকার। জার্মেনির ভূবিজ্ঞানী আল্‌ফ্রেড হেবেগেনার অনেক দিন আগে প্রস্তাব করেন যে বর্তমান মহাদেশগুলি দূর অতীতে জোড়া ছিল একটি মাত্র প্রকাণ্ড ভূখণ্ডে, ক্রমে ভাগ হয়ে সরে গিয়েছে। তাঁর নজির ছিল যে পাশাপাশি বসালে এরা মোটামুটি খাপ খায় (যেমন দক্ষিণ আমেরিকা ও পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল), তা ছাড়া বিভিন্ন খণ্ডের উদ্ভিদ ও জন্তুদের মধ্যে প্রায়ই আশ্চর্য আত্মীয় সম্পর্ক দেখা যায়। প্রথমে বিজ্ঞান জগৎ এই তত্ত্ব উড়িয়ে দিয়েছিল, এখন তা সুপ্রতিষ্ঠিত। আধুনিক তথ্য অনুসারে প্রথমে দুটি ভাগ হয়েছিল, তাদের বলা হয় লরেশিয়া ও গন্‌ড়োআনাল্যান্‌ড (বর্তমান আফ্রিকা, ভারত ও অসট্রেলিয়া নিয়ে এই দ্বিতীয় মহাদেশটির নাম এসেছে মধ্য প্রদেশের গন্‌ড্‌ উপজাতির রাজ্যের আখ্যা থেকে)। প্রায় ১৮ কোটি বছর আগে আমেরিকা মহাদেশ খণ্ডিত হয়ে য়োরোপ ও আফ্রিকার থেকে সরে যেতে শুরু করে, এখনও এই ব্যবধান বাড়ছে বছরে আন্দাজ আড়াই সেনটি-মিটার। ভূবিজ্ঞানীদের বিশ্বাস পৃথিবীর বহিরাবরণ প্রধানত দশটি ১১০ কিলোমিটার পুরু বিশাল শিলা খণ্ড বা প্লেট দিয়ে তৈরি, সেগুলি তপ্ত আধা-তরল বস্তুর উপর অতীব ধীরে ধীরে ভেসে বেড়াচ্ছে, তাদেরই চলাচলে এই গ্রহের ত্বক ভাঙে ও জোড়ে, ঠেলায় ও ঘষাঘষিতে নতুন পাহাড় মাথা তোলে, ভূকম্প হয়, আগ্নেয়গিরি জেগে ওঠে ; এ যুগের অধিকাংশ আগুনে পাহাড় প্লেট প্রান্তে অবস্থিত।

এই সব ভৌগোলিক ও আবহাওয়ার পরিবর্তন তাদের ছাপ রেখে গিয়েছে শুধু বিভিন্ন শ্রেণীর পাথরের মধ্যেই নয়, নানা রকম নতুন জীবের উদ্ভবের মধ্যেও। এই প্রক্রিয়াকে ডারুইন বলেছেন 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' (natural selection)। কিন্তু সেই আলোচনার আগে জীব জগতে বৈজ্ঞানিক নামকরণ ও নামের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে দু কথা বলে নেওয়া দরকার। জীবাণুর থেকে আরম্ভ করে উদ্ভিদ ও প্রাণী কুলের প্রত্যেক জীবের সম্পূর্ণ নামে দুটি অংশ, প্রথমটি নির্দেশ করে গণ (genus), দ্বিতীয়টি প্রজাতি (species)। প্রজাতির মধ্যে থাকতে পারে সংকীর্ণতর উপপ্রজাতি (sub-species), জাতি (race) ও প্রকার (variety) ; তেমনি গণের আগে ক্রমশ ব্যাপক ধাপ আছে গোত্র (family), বর্গ (order), শ্রেণী (class), পর্ব (phylum) এবং সর্গ (kingdom) ও তাদের উপবিভাগ। সর্গ মাত্র দুটি—উদ্ভিদ ও প্রাণী (বাংলায় animal-এর প্রতিশব্দ প্রাণী, যদিও উদ্ভিদও সপ্রাণ)। অবশ্য প্রোটিস্‌টা নামক একটি তৃতীয় সর্গ সম্প্রতি বেশী ব্যবহার হচ্ছে, এককোষ ও সরল গঠনের বহুকোষ জীবাণু তার

অন্তর্গত, যথা ব্যাকটিরিয়া, ছত্রাক (fungi), অ্যাল্‌জী জাতীয় শেওলা, প্রোটোজোআ ইত্যাদি। কিন্তু সাধারণ ভাবে জীব জগতে প্রধান দুই ভাগই চলিত, তদনুসারে উপরোক্তদের মধ্যে প্রোটোজোআ সরলতম এক কোষের প্রাণী, অন্যরা উদ্ভিদ। সংকীর্ণতর বিভাগে জীবদের মধ্যে সম্পর্ক নিকটতর (যেমন কুকুর ও নেকড়ের) এবং তাদের উদ্ভব অপেক্ষাকৃত পরে। প্রথম ধাপ থেকে বর্তমান মানুষের বংশ পরিচয় হল : সর্গ—প্রাণী (Animalia), পর্ব—মেরুদণ্ডী ও তন্নিকট (Chordata), শ্রেণী—স্তন্যপায়ী (Mammalia), বর্গ—প্রাইমেট (Primates), গোত্র—হোমিনিডি (Hominidae), গণ—হোমো (Homo), প্রজাতি—সেপিয়েন্‌স (sapiens)। এই সব আখ্যা ল্যাটিন, হোমো = মানুষ, সেপিয়েনস = যে ভাবতে জানে : এক কথায় বুদ্ধিমান মানুষ (নামটি দিয়েছেন সুইডেনের বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী ফন্‌ লিনে)। এই ধরনের নামকরণের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক নামেরও সাদৃশ্য আছে, যেমন নিবারণ চক্রবর্তীর প্রথম নামটি বিশেষ, দ্বিতীয়টি বংশগত। অবশ্য বৈজ্ঞানিক আখ্যাতে সাধারণ নামটি আগে বসে, যেমন দক্ষিণ ভারতে তামিলদের।

বর্তমান মানুষের অনেক জাতি হলেও তারা সবাই এক প্রজাতির অন্তর্গত, কিন্তু পুরামানবদের নামকরণ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে প্রায়ই নিদারুণ মতভেদ হয়। তার একটা কারণ প্রজাতির সীমা সর্বদা নিঃসন্দেহে স্পষ্ট চিহ্নিত করা যায় না। সংজ্ঞার্থ অনুসারে প্রজাতি হল এমন এক স্বাভাবিক গোষ্ঠী যে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সন্তান প্রজনন সম্ভব নয়, আর সন্তান হলেও তারা নিজেরা প্রজননে অক্ষম ; যেমন গাধা ও ঘোড়ার থেকে খচ্চর, অথবা বাঘ ও সিংহের সংগমে কলকাতা চিড়িয়াখানার টাইগন। কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে, এখানেই মাদী টাইগন ও সিংহ থেকে তিনটি বাচ্চা হয়েছিল, অনেকটা সিংহেরই অনুরূপ এক মর্দা শাবককে লিটাইগন নাম দিয়ে ১৯৮০ মার্চ মাসে সাধারণকে দেখানো হয়, তার যমজ দুটি জন্ম কালেই মরে গিয়েছে। তেমনি হাজারে একটি খচ্চর হয়তো বন্ধ্যা নয়। পরীক্ষাধীন অবস্থায় এমন আরও উদাহরণ আছে, কিন্তু সেগুলি স্বাভাবিক সংগম নয়।

এখন দেখা যাক কি করে প্রাকৃতিক নির্বাচনে নতুন জীবের সৃষ্টি হয়। তাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য—যেমন ফুলের রং, নাকের আকৃতি, স্বভাবেরও কিছু কিছু—নির্ধারণ করে দেহকোষের বিভিন্ন বংশকণিকা, কিন্তু নিউক্লিইক অ্যাসিডের সামান্য আণবিক প্রভেদের ফলে একই কণিকার পৃথক রূপও হয়। সন্তান সৃজনের আরম্ভ কালে জনক জননীর বংশকণিকার মিশ্রণ ও নতুন বিন্যাস ঘটে, অনেকটা এক দান তাস খেলে বেঁটে নেওয়ার মত, তাই এক ভাইয়ের চোখ কালো, আর এক ভাইয়ের কটা হতে পারে। সুতরাং জন্মগত প্রভেদের ফলে

যে কোনও প্রাকৃতিক পরিবেশের পটভূমিতে একই প্রজাতির সব জীবের যোগ্যতা সমান নয় ; যাদের মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য আছে যা সেই অবস্থায় বেঁচে থাকতে সাহায্য করে তারা টেকে, অন্যরা প্রতিযোগিতায় পিছনে পড়ে বংশপরম্পরায় ক্রমশ লোপ পায়। জিরাফের পূর্বপুরুষদের মধ্যে যার গলা অন্যের তুলনায় সামান্য লম্বা ছিল সে উঁচু ডালের পাতা খেতে কিছু সুবিধা পেল, তার ফলে বেশী বংশ বৃদ্ধি ও দীর্ঘ গ্রীবার বংশকণিকা বিস্তার। এই ভাবে বহু সহস্র বছরে একটু একটু করে মূর্তি পেল বর্তমান লম্বগ্রীব জন্তুটি, অযোগ্য জাতভাইরা বিদায় নিল। এরই নাম 'যোগ্যতমের জিত' (survival of the fittest)। বংশকণিকার অস্তিত্ব ডারুইন জানতেন না, তিনি তাঁর অভিব্যক্তিবাদ (theory of evolution) গড়েছিলেন বাইরের ভেদাভেদ লক্ষ্য করে। অবশ্য এই তত্ত্ব মেনে নেওয়া সভ্য মানুষের পক্ষে সহজ হয় নি, তা আমরা দেখব পরে।

কখনও কখনও প্রকৃতির খেয়ালে বংশকণিকার আকস্মিক পরিবর্তন বা মিউটেশন (mutation) ঘটে। সম্প্রতি রঞ্জন বা এক্স্ রশ্মির সাহায্যে ও অন্যান্য উপায়ে মানুষও শিখেছে এই কারসাজি, সুতরাং আজ সে পরীক্ষাগারে সৃষ্টি করতে পারে নতুন জাতের জীব। তা ছাড়া মানুষের আবির্ভাবের ফলে প্রকৃতির আর সে চেহারা নেই, তার অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটেছে অল্প দিনে, সুতরাং প্রকৃতির নাটমঞ্চেও প্রায় আমাদের চোখের সামনে তৈরি হচ্ছে নতুন জীব।

একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে এখানে। ডারুইনের নিজের দেশ ইংলন্ডের নানা জায়গায় কয়েক রকম মথ জাতীয় পতঙ্গ উড়ে বেড়াত, তাদের পাখার রং প্রধানত সাদা, তার মধ্যে কালো রেখার আঁকিবুকি। ঐ সব অঞ্চলের যে গাছে তারা বসত তাদের গায়েও এক ধরনের ছাতা গজিয়ে রং দাঁড়াত অনেকটা ঐ রকম। মিউটেশনের ফলে সাদার মধ্যে মাঝে মাঝে কালো জাতের মথও দেখা দিত, কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল অনেক কম। বিগত শতাধিক বছরের মধ্যে কিন্তু সাদার তুলনায় কালোর সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল, মনে হল অদূর ভবিষ্যতে এদের মধ্যে কেউ কেউ সম্পূর্ণ নতুন প্রজাতি হয়ে দাঁড়াতে পারে। এর কারণ হল ঐ সব অঞ্চলে নতুন কারখানা গড়ে ওঠাতে গাছের উপর কালি পড়েছে, সেই পটভূমিতে সাদা পতঙ্গ পাখিদের চোখে পড়েছে সহজে ; যদিও বছর কয়েক আগে গাছের সঙ্গে গা মিলিয়ে তারাই শত্রুর চোখে ধুলো দিত, নতুন দৃশ্যে কালো যোগ্যতর—সুতরাং তারই জয়। কিন্তু এখানেই নাটকের যবনিকা নয়। বিগত কয়েক বছরে সর্বত্র দূষিত বাতাস শোধনের উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছে, তার ফলে আবার দৃশ্য বদল ; বাতাস পরিষ্কার হয়ে গাছের চেহারাও ফিরে গেল, এখন আবার সাদা মথের প্রাচুর্য। এই দৃষ্টান্তে অবশ্য

ভিন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করল প্রকৃতি নয়, মানুষ—কিন্তু প্রক্রিয়াটা সর্বত্রই এক। হয়তো ঐ অঞ্চলে কোনও খনি আবিষ্কারের ফলেই কারখানা গড়ে উঠেছিল···কে জানত মাটির নিচের জড় পাথরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বায়ুচর এক জীবের ভাগ্য! প্রকৃতির হাত প্রচ্ছন্ন হলেও এখানেও মূলে আছে সে।

কৃত্রিম উপায়ে এই ধরনের নির্বাচন অবশ্য বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে ফলিয়েছেন অনেক দিন আগেই। আজকের বহু জাতের ফুল ফল কুকুর ঘোড়া ইত্যাদি তার সাক্ষী। প্রকৃতি তার নিজের পরীক্ষা চালিয়েছে প্রাণ সৃষ্টির শুরু থেকে, কোটি কোটি বছর কেটে গিয়েছে বৃহত্তর প্রাণীদের আবির্ভাব থেকে অবলোপে। ভাবতে অবাক লাগে যে সৃষ্টির গোড়াতে যদি এই অতিসূক্ষ্ম বংশকণিকা না থাকত, না থাকত জন্মে জন্মে তাদের নতুন বিন্যাস, তা হলে ভাইয়ে ভাইয়ে পার্থক্যের সম্ভাবনাও থাকত না, প্রাণ থেমে থাকত অপরিবর্তনের অন্ধকূপে। ব্যাকটিরিয়া থেকে হাতি বা মানুষ কোনও দিন সৃষ্টি হত না।

এখানে ফসিল সম্বন্ধে দু কথা বলা দরকার কারণ যুগান্তরের সাক্ষী তারা, প্রাচীন জীবদের ইতিহাস ও উত্থান পতন সম্বন্ধে আমরা জেনেছি দেহের এই সব অবশিষ্ট চিহ্ন থেকে। তার অভাবে অনেক প্রাণী যে একদা পৃথিবীতে উপস্থিত ছিল তা জানাও যেত না, অনেকে নিশ্চয় চির দিন অগোচরে থেকে যাবে। প্রতি বছর সারা বিশ্বে উদ্ভিদ ও প্রাণীর অসংখ্য ফসিল সংগৃহীত হয়, তার অধিকাংশই পরিচিত জীবের দেহাবশেষ হলেও নতুন আবিষ্কারও ক্রমশ যোগ হচ্ছে। প্রায় প্রতি যাদুঘরে সাজানো আছে দুর্ভাগা কীট পতঙ্গ যারা গাছের আঠায় বন্দী হয়ে মরেছে, আঠা জমে হয়েছে স্বচ্ছ অ্যাম্বার, সেই আবরণের ভিতর স্পষ্ট দেখা যায় প্রাণীটির সম্পূর্ণ সংরক্ষিত সূক্ষ্ম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। সমুদ্রে প্রবাল-কীট বা অন্য ক্ষুদ্র প্রাণীর শরীর থেকে ক্ষরিত চুনাপাথরের বা আর কোনও কঠিন বস্তুর উপাদান তাদের কোমল দেহের উপর জমে প্রায় অক্ষয় ছাঁচ বানিয়ে রাখে। সাগর তলে সৃষ্ট পাথরে প্রায়ই ফসিল পাওয়া যায়, প্রথমে মৃত উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহাবশেষ ধীরে ধীরে নিচের বালুকাময় পলিতে ডোবে, উপর থেকে ঝরা পলিতেও ঢাকা পড়ে। পলি ক্রমে কঠিন পাথরে পরিণত হয়, তার ভিতরে দেহ-বস্তু বা হাড় কখনও কখনও অক্ষত রূপে সংরক্ষিত থাকে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদেরও রূপান্তর হয়; সমুদ্রের জল পাথরের ভিতর চুঁইয়ে ঢুকে আদি বস্তু গলিয়ে পরিবর্তে রেখে যায় আকরিক পদার্থ, তা জমে হয়ে পড়ে দেহ-বস্তুর আকারে গড়া পাথর; জল যখন দেহ-বস্তু গলিয়ে আকরিক কিছু রেখে যায় না তখন শিলার গায়ে পড়ে থাকে

শূন্য এক ছাঁচ, তার থেকেও আদি জৈব বস্তুর আকার আকৃতি ও সূক্ষ্ম গঠনের খবর পাওয়া যায়। অনেক পরে একদা সাগর সরে গেলে ফসিল-যুক্ত শিলা উন্মুক্ত হয়, তখন তার বয়স নির্ণয় করা চলে। পশ্চিম ক্যানাডার স্টিফেন গিরি অঞ্চলে ৫০ কোটি বছর আগে দলে দলে চিংড়ি ও কাঁকড়া জাতীয় খোলকাবৃত প্রাণী, সামুদ্রিক ক্রিমি, জেলিফিশ ইত্যাদি অতি সূক্ষ্ম কাদার স্রোতে ঢাকা পড়েছিল, কাদা কঠিন হয়ে তাদের কোমলতম দেহাংশের বেশ কিছু ছাপ ধরে রেখেছে। কোথাও কোথাও গাছের পাতা কিংবা ফড়িঙের পাখা পলি স্তরের চাপে কারবনে পরিণত হয়েছে, এই বস্তুর পাতলা পাতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেখাও স্পষ্ট প্রতীয়মান।

যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় অঞ্চলে ২৮ কোটি বছর প্রাচীন কোনও ফার্ন-সদৃশ গাছের অসংখ্য পাতার মধ্যে একটির এই রকম হুবহু স্বাক্ষর পাওয়া গিয়েছে কয়লার গায়ে। প্রায় ১০ কোটি বছর আগে বর্তমান টেক্সাস অঞ্চলে সওয়া চার মিটার লম্বা এক সামুদ্রিক মাছ গিলেছিল সওয়া এক মিটার মাপের আর একটিকে, খড়ির পট-সংযুক্ত খাদকের কঙ্কালের মধ্যে দেখা যায় খাঁচার পাখির মত অবরুদ্ধ তার খাদ্য। জার্মেনির ব্যাভেরিয়াতে এমনি এক চুনাপাথরের পটে চমৎকার সংরক্ষিত হয়েছে এক জন্ম মৃত্যুর লীলা, প্রায় ১৭½ কোটি বছর আগে ইকৃথিওসরাস নামক একটি জলচর সরীসৃপ একের পর এক বাচ্চা প্রসব করতে করতে হঠাৎ কোনও কারণে সপরিবারে মরেছে—তখনও গর্ভে কয়েকটি, একটি অর্ধনির্গত, একটি বাইরে মায়ের পাশে শায়িত ; সরীসৃপরা ডিম পাড়ে এই প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসের পরিপন্থী আবিষ্কারটি জীববিজ্ঞানীদের অবাক করেছে। প্রাণী বিশেষের ভাগ্য সম্বন্ধেও ফসিল মাঝে মাঝে নতুন খবর দেয়, যেমন হাড়ের ক্ষত নির্দেশ করতে পারে প্রাকৃতিক অপঘাত, যুদ্ধ বা আক্রমণ, অথবা রোগ ; বিকৃত অস্থি থেকে জানা গিয়েছে আদিম মানুষ, অন্যান্য স্তন্যপায়ী এমন কি বহু কোটি বছর আগে সরীসৃপ ও বিশাল ডাইনোসররাও বাতের রোগে ভুগেছে। সুতরাং এক দিকে যেমন ফসিল জীব জগতের ধারাবাহিক ইতিহাস গড়ে তুলতে সাহায্য করে, বিশেষত লুপ্ত প্রাণীদের সন্ধান দিয়ে, তেমনি এই রকম নানা দিকেও নতুন তথ্য সরবরাহ করে।

জল বা স্থলে সব অবস্থায় অবশ্য মৃতদেহ অশ্মীভূত হয় না। খোলা জমিতে মরবে যে জন্তু হয়তো হায়না কি অন্য কোনও সর্বনাশা পশু তার হাড় পর্যন্ত গুঁড়িয়ে ফেলবে, তা ছাড়া আছে রোদ বৃষ্টি মাটির প্রভাব, এরা সবাই মিলে কয়েক বছরে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেবে সেই দেহাবশেষ। এই সব উপদ্রব না থাকলেই দেহাংশ অশ্মীভূত হওয়ার সুযোগ পায়। কাদা, বরফ, আগ্নেয়গিরির লাভা, ছাই ও অন্যান্য উদ্গিরণ ইত্যাদি

অনেক সময়ে স্থলচর প্রাণীর হাড় এমন কি সম্পূর্ণ দেহ সংরক্ষণ করেছে। কোথাও কোথাও দলে দলে বিভিন্ন জন্তু একত্র মরে খুশী করেছে ভবিষ্যৎ কালের পুরাজীববিজ্ঞানীদের।
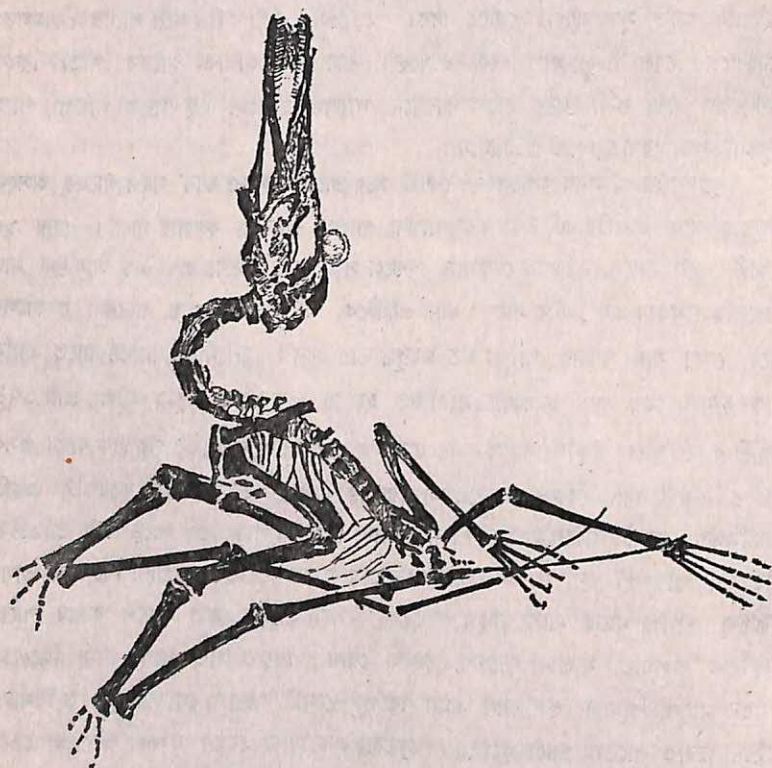
চিত্র ৩। ব্যাভেরিয়ার সমুদ্র তলে অশ্মীভূত আকাশচর সরীসৃপ টেরোডাক্টিলের কঙ্কাল চুনাপাথরে সংরক্ষিত, জায়গাটা বিষাক্ত ছিল বলে প্রাণীটি কোনও খাদকের পেটে যায় নি।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফর্নিয়া প্রদেশে এমনি এক গোরস্থান রচনা করেছিল আগ্নেয়গিরির উদগীর্ণ শিলাজতু। আলকাতরার মত এই জিনিসটি আজ জমে কঠিন হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তখন সবে উপরটা জমেছে, ভিতরে নরম; মাঝে মাঝে নিচু জায়গায় জল জমে তৈরি হয়েছে

ছোট খাটো পুকুর। সেখানে তৃষ্ণা মেটাতে এক বীভৎস বিয়োগান্ত নাটকের প্রথম দৃশ্যে এল অতিকায় হাতি, স্লোথ্ আর বাইসন থেকে আরম্ভ করে ঘোড়া, হরিণ, শুয়োর, ক্ষুদ্র খরগোশ, ছুঁচো, এমন কি বাদুড় পর্যন্ত। শিলাজতু যখন ভিতরে টেনে নিয়ে বন্দী করলে এদের, ব্যর্থ আর্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ হল, তখন তাই শুনে এদের জীবন্ত দেহ থেকে মাংস ছিঁড়ে খাওয়ার লোভে ছুটে এল সে কালের ভয়ংকর খড়গদন্তী বাঘ, যার মুখের সামনে ঝুলে থাকত প্রকাণ্ড দুটি দাঁত; তাদের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল নেকড়ে। কিন্তু প্রকৃতির ফাঁদ তাদেরও পা কামড়ে ধরল। তৃতীয় দৃশ্যে এদের খেতে উড়ে এল শকুনির দল। ধীরে ধীরে নিশ্চিত মৃত্যুর গহ্বরে তলিয়ে গেল সকলে। বহু সহস্র বছর পরে বিজ্ঞানীরা উদ্ধার করলেন এই অসংখ্য কঙ্কাল। এদের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে অন্তত ৩০ প্রজাতির বড় ও আরও বহুসংখ্যক ছোট স্তন্যপায়ী জন্তু, ৩০ রকম শিকারী পাখি এবং এ ছাড়া চল্লিশেরও বেশী অন্য জাতের প্রাণী। মাত্র সাড়ে চার মিটার চওড়া, সাড়ে সাত মিটার লম্বা আর ১০½ মিটার গভীর জায়গার মধ্যে ছিল সতেরটি হাতি। সে সময়ে ঐ অঞ্চলে যাদের বাস ছিল তারা সকলেই স্থান পেয়েছে ঐ বারোয়ারী কবরখানায়। এক-মাত্র ভালুক অত্যন্ত চতুর বলে তার সংখ্যা খুব কম (এই কারণে বানর, বনমানুষ ও মানুষের ফসিলও বিরল)। এই প্রাণীদের মধ্যে আজ কেউ কেউ আর পৃথিবীতে নেই, কারও বা বাস এখন অনেক দূরে—কিন্তু সকলেই নাম ঠিকানা রেখে দিয়েছে ফসিলের দলিল। পুরা কালে আগ্নেয়গিরিগুলি অনেক বেশী তেজী ছিল, জ্বলন্ত লাভাও হঠাৎ তেড়ে এসে দগ্ধে মেরেছে পাল পাল পশু, ফসিল হয়েছে তারা।

ক্যালিফর্নিয়ার নিদারুণ অপঘাতের সূচনা যেমন তৃষ্ণার তাড়নায়, তেমনি ক্ষুধার যাতনা মরণ ফাঁদে ঠেলেছিল এক দল ম্যাস্টোডনকে (এক বিলুপ্ত প্রাচীন হাতি, পা অপেক্ষাকৃত ছোট, দাঁত প্রকাণ্ড)। মধ্য এশিয়ায় পাওয়া গিয়েছে এই অতিকায় জন্তুদের এক বিশাল কবরখানা, ঐ অঞ্চলে এক বৃহৎ হ্রদের ধারে বহু শতাব্দী ধরে তারা নিশ্চিন্তে বাস করছিল, জলের কিনারে আহার্য গাছপালার অভাব ছিল না। কিন্তু একদা হ্রদ শুকাতে আরম্ভ করল, সঙ্গে সঙ্গে তরু লতাও সরে গেল ভিতরের দিকে, অবশেষে পেটের দায়ে বেশী দূর ঢুকে পড়ার ফলে হুড়মুড় করে হাতির দল পড়ল কাদায়, আর উঠতে পারল না। সম্ভবত কয়েক হাজার হাতির জীবন্ত সমাধি হয়েছিল এখানে, অবশ্য সবচেয়ে পরে যারা মরেছিল তাদের দেহগুলিই পাওয়া গিয়েছে উপরের দিকে।

বহু প্রাণী অবশ্য একলাও মরেছে এমন অবস্থায় যা ফসিল সংরক্ষণের সহায়ক। কখনও কখনও বরফ রক্ষা করেছে মৃতদেহ। সাইবেরিয়ার নানা স্থানে বরফ-জমা জমিতে

উদঘাটিত হয়েছে লোমশ গণ্ডার ও আরও এক প্রাচীন হাতি ম্যামথের সম্পূর্ণ অক্ষত দেহ—ঠিক যেমনটি ছিল হয়তো ১৫,০০০ বছর আগে যে দিন তারা মরেছে সম্ভবত নরম পলিমাটির কাদায় আটকে পড়ে। সে কালের প্রকাণ্ড বুনো ষাঁড়ের ফসিলও কিছু পাওয়া গিয়েছে সাইবেরিয়ায়, তার নাম অরকৃস্ (aurochs)। প্রাগিতিহাসের মানুষ খাদ্যের অন্বেষণে যে সব বন্য জন্তু শিকার করেছে এই তিনটি হিংস্র প্রকাণ্ড পশু তাদের অন্যতম।
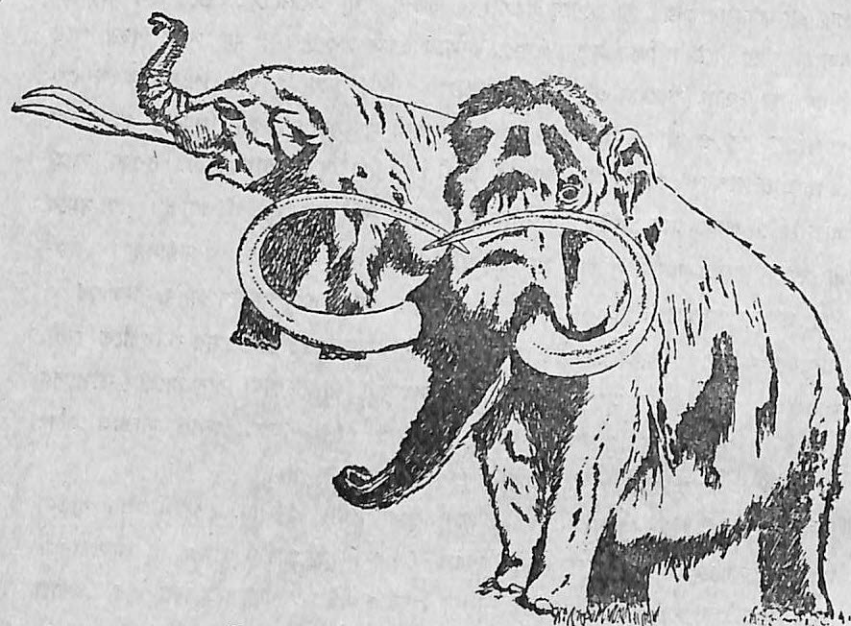
চিত্র ৪। পিছনে ম্যাস্টোডন, সামনে ম্যামথ।

ম্যামথের দেহ পাওয়া গিয়েছে সবচেয়ে উত্তরাঞ্চলে, সেই ঠাণ্ডায় মুখের দাঁত, গায়ের চামড়া তো বটেই, কখনও প্রতিটি লোম এমন কি পেটের ভিতরে ঘাস পাতার পর্যন্ত কোনও পরিবর্তন হয় নি। কখনও বা মাংস ছিল এত টাটকা যে মজুররা তা খেতে আরম্ভ করে দিল সঙ্গে সঙ্গে। ১৭৯৯ সালে এমনি এক ম্যামথের দাঁত খুলে এনে বিক্রি করা হল, তখন ধড়টি কুকুর আর নেকড়েতে খেয়েছিল বৎসরাধিক কাল ধরে। মরা ম্যামথের দামও লাখ টাকা!

উত্তর সাইবেরিয়ায় একটি ম্যামথের দেহ পাওয়া গিয়েছিল আশ্চর্য স্বাভাবিক ভঙ্গিতে —খাড়া দেহ, একটি পা তোলা, মুখে তাজা ঘাস পাতা। ১৯৭৭ সালে সাইবেরিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এক সোভিয়েট বুলডোজার চালক আবিষ্কার করেছেন চিরতুষার স্তরে জড়িত এক ম্যামথ শিশু, প্রায় ৪০,০০০ বছর আগে হয়তো জলে বা কাদায় পড়ে মরেছিল বেচারা—তার অসহায় মা কাছে দাঁড়িয়ে দেখেছে কিনা কে জানে। রাশিয়ার যাদুঘরে সাজানো আছে লম্বা লোমে ঢাকা ম্যামথের চামড়া এবং একটি জানোয়ারের শুধু শুঁড়ের ডগাটি ছাড়া সম্পূর্ণ অক্ষত দেহ—ভাবতেও শিহরণ হয় যে এদেরই কোনওটাকে হয়তো একদা তাড়া করেছিল পুরাপ্রস্তর যুগের গুহাবাসী মানুষ। কঙ্কাল যতই সুসম্পূর্ণ হক, তার থেকে যে প্রাণীটিকে গড়ে তোলা হয় তার ছাল আর চুলের চেহারা অনেকাংশে কল্পিত, কিন্তু যখন সবই 'সশরীরে' বর্তমান তখন কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। অশ্মীভূত অস্থি খণ্ডের তুলনায় এই ধরনের আবিষ্কারের দাম অনেক বেশী।

প্রায় ১০,০০০ বছর আগে শেষ তুষার যুগ অপসরণের সঙ্গে শীতের প্রাণী ম্যামথ বিদায় নিয়েছে, কিন্তু ১৯৮০ সালের এক খবরে প্রকাশ এই সব দেহ বরফে এত অবিকল সংরক্ষিত ও অক্ষত যে লেনিনগ্রাডের এক বিজ্ঞানী আশা করেন তাদের দেহ-কোষ থেকে জীবন্ত প্রাণীটিকে নতুন জন্ম দান করা সম্ভব হবে, তিনি এই 'টেস্ট টিউব' ম্যামথ সৃষ্টির কাজে লেগেছেন। প্রাচীন মানুষ তাদের গুহাচিত্রে অধুনালুপ্ত অরক্স ও বুনো ঘোড়া প্রায়ই রূপায়িত করেছে, তার সঙ্গে মিলিয়ে তাদের বংশধরদের থেকে প্রজনের (breeding) সাহায্যে অন্যত্র আদি জন্তুগুলির পুনঃসৃষ্টি অনেকটা সফল হয়েছে। কিন্তু প্রায় সব ক্ষেত্রে লুপ্ত প্রাণীদের চেহারাটি গড়ে তুলতে নির্ভর শুধু মাত্র কয়েক খণ্ড হাড়, সম্পূর্ণ কঙ্কালও বিরল। অবশ্য এই পুনর্গঠন সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়, তা এখন এক বিশেষ শিল্প, যাদুঘরে যে বিশাল ডাইনোসর বা আমাদের বনমানুষ-সদৃশ পূর্ব-পুরুষদের মূর্তি অবাক বিস্ময়ে দেখি তা গড়া হয় তারই নিয়ম অনুসারে যুক্তিপূর্ণ অনুমানের সাহায্যে—এ সম্বন্ধে যথাস্থানে পরে আলোচনা হবে। এ যেন কিছু ভাঙা দেয়াল থেকে সম্পূর্ণ বাড়িটির মূর্তি দান ; রূপকটি আক্ষরিক সত্য, বিশেষজ্ঞরা এই কাজ প্রায়ই করে থাকেন—সার আর্থার এভান্স কৃত তিন সহস্রাধিক বছর প্রাচীন ক্রীটের রাজ-প্রাসাদের পুনর্গঠন এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৩। বানর বনাম দেবদূত

এলেম আমি কোথা থেকে—এ প্রশ্ন মানুষকে অস্থির করেছে দূর অতীত কাল থেকে, হয়তো যখন খাওয়া থাকার ভাবনার বাইরে অন্য কিছু ভাবতে আরম্ভ করেছে সে। এর জবাব খুঁজতে সে কালের কবিরা নানা রকম কল্পনার জাল বুনেছেন, দেশে দেশে পুরাণ কাহিনীতে থেকে গিয়েছে সেই সব বিচিত্র কথা। গ্রীষ্মের দেশ মিশরে সব দেবতার সেরা সূর্যদেব রা, তার চক্ষুতেজ থেকে সৃষ্টি প্রথম নর নারীর ; উত্তর য়োরোপের বনাবৃত তুষার রাজ্যে এদের দেহ-বস্তু তৈরি হয়েছে দুটি শীতদেশীয় তরুর থেকে। ইহুদীদের ঈশ্বর পৃথিবীর চার দিক থেকে চার মুঠো ধুলো নিয়ে বানিয়েছিলেন আদম ও লিলিথকে। এক চৈনিক কথিকায় পান্ কু নামক এক জীবের দেহের পোকা থেকে মানুষ জাতির উদ্ভব। মধ্য আমেরিকার মায়া সৃষ্টিপুরাণে কথিত আছে দেবতারা মানুষ গড়তে প্রথমে পরীক্ষা করেছিল মাটি দিয়ে, পরে কাঠ দিয়ে ; তারও পরে আদর্শ মানুষের উপাদানটি পাওয়া গিয়েছে ভুট্টার মধ্যে (যা সে দেশের প্রধান শস্য, অপরিহার্য প্রাণ-বস্তু)। কিন্তু, যেমন প্রায়ই দেখা যায়, এই প্রসঙ্গেও সবচেয়ে সুন্দর হল গ্রীসের পুরাকাহিনী। দেবতারা প্রথমে গড়েছিল এক দল সোনার মানুষ—তাদের কালে পৃথিবীতে ছিল চিরবসন্ত, বসুন্ধরা তার ফল ফসল উজাড় করে দিত প্রতিদানে কোনও পরিশ্রম দাবি না করে, নিরঙ্কুশ নিশ্চিন্ত জীবন এত দীর্ঘ ছিল যে প্রকৃত জ্ঞান আহরণ সম্ভব হত তখন। কিন্তু খেয়ালী দেবতারা হঠাৎ এদের ধ্বংস করে বানালে রূপার মানুষ—সেই সময়ে দেখা দিল শীত গ্রীষ্ম ইত্যাদি ঋতু, প্রকৃতি তখন আর অত সদয় নয়, মানুষকে বাসা বানাতে হল ; জ্ঞান অর্জনের আগেই এসে দাঁড়াত মৃত্যু। তার পর এরাও বিদায় নিল, এল কাঁসার মানুষ—তাদের দীর্ঘ কঠিন দেহ, হাতে ধাতুর হাতিয়ার ; কিন্তু আয়ু আরও কম—লড়াইয়ে প্রাণ যেত অল্প বয়সেই। সব শেষে এল এ যুগের এই হতভাগ্য মানুষ, কপালে তার অন্তহীন শ্রমের অভিশাপ আঁকা, আর তাই লোহার তৈরি দেহ ; কিন্তু দেখতে দেখতে সেই লোহাও ক্ষয়ে যায়, মরণ আসে দ্রুত ; স্বর্ণ যুগের জ্ঞান, রজত যুগের সারল্য, কাংস্য যুগের শক্তি কিছুই নেই এই বেচারাদের। এখানে মনে পড়ে আমাদের চতুর্যুগ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এগুলিকেও কখনও কখনও স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও লৌহ

যুগ বলা হয়। চতুর্যুগের ঐতিহ্য পারস্যেও ছিল, এবং সম্ভবত তা তিন দেশে একই আর্য সূত্র থেকে উদ্ভূত। এই আখ্যায়িকা যতই রূপকথার মত শোনাক, মানুষের প্রাগিতিহাসের সঙ্গে এর কিছু কিছু অপ্রত্যাশিত মিল চোখে পড়ে, যেমন বিভিন্ন ধাতু বা গৃহ নির্মাণ বা যুদ্ধের ক্রমিক আবির্ভাবে।

এই ধরনের কাহিনী নিয়েই জগতের জনসাধারণ বেশ নিশ্চিন্ত মনে সন্তুষ্ট ছিল এই সে দিন পর্যন্ত। অবশেষে ১৮৫৯ সালে এক আকস্মিক বিস্ফোরণের ফলে সর্বপ্রথম এই নির্বিবাদ স্থির শান্তিতে দারুণ আঘাত লাগল, বিশেষ করে পাশ্চাত্ত্য জগতে। এই বোমাটি ডারুইনীয় ক্রমবিকাশ তত্ত্ব বা অভিব্যক্তিবাদ নামে পরিচিত—প্রাকৃতিক নির্বাচনের পথে নতুন প্রাণীর সৃষ্টি ও বিকাশ কি করে ঘটে চার্লস ডারুইন (১৮০৯-১৮৮২) তা ব্যাখ্যা করলেন এক বইতে, যার সংক্ষিপ্ত নাম 'প্রজাতির উদ্ভব' (On the Origin of Species)। এ বইতে তিনি স্পষ্ট মানুষের আলোচনা করেন নি, উপসংহারে শুধু ছিল একটি সতর্ক বাক্য: "মানুষের উদ্ভব ও ইতিহাসের উপর আলোকপাত হবে।" The Descent of Man গ্রন্থে ২২ বছর পরে তিনি অভিব্যক্তির পথে মানুষ ও বানরের নিকট সম্পর্কের ব্যাখ্যা করেছিলেন, কিন্তু বাদ প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল প্রথম বইটির পরেই। তার কারণ যদিও তাঁর তত্ত্ব অনুসারে বর্তমান বনমানুষ ও মানুষ একই লুপ্ত প্রাইমেট বর্গীয় পূর্বপুরুষ-জাত, সুতরাং শিম্পান্জি বা গরিলার সঙ্গে আমাদের নাতি ঠাকুরদা সম্পর্ক নয়, তবু সাধারণ লোকের মানহানি হল মানুষকে এদের সাক্ষাৎ বংশধর ভেবে। দেশের নেতারা এমন কি পণ্ডিতরা পর্যন্ত ক্ষেপে উঠলেন, অবিশ্বাস জানাতে লাগলেন যাকে বলে জ্বালাময়ী ভাষায়। এর মধ্যে উর্স্টারের বিশপ-পত্নী বেশ একটা মজার কথা বললেন নিজের অজানতে ; নর ও বানরের প্রস্তাবিত আত্মীয়তা সম্বন্ধে মহিলাটির মন্তব্য: "আশা করি কথাটা সত্য নয়, তবে সত্য হলেও আমরা প্রার্থনা করব যেন লোক-জানাজানি না হয়।" খবরটি সত্য, তাই ক্রমে অনেকে অবিশ্বাসী ডারুইনকে সমর্থন করলেন, বিশেষত ঐ দ্বিতীয় বইতে সন্নিবিষ্ট যুক্তি সাক্ষ্যের পর।

তৎকালীন প্রতিবাদের কারণ অবশ্য এই যে তখন পাশ্চাত্ত্য জগতে প্রায় সকলেরই মনে ইহুদী-খ্রীষ্টীয় পুরাণের সূত্র ধরে এই বিশ্বাস ছিল যে পৃথিবী ও সমগ্র প্রাণী কুল মাত্র ছ দিনে সৃষ্টি হয়েছে এবং তার পরে আর যোগ বিয়োগ কিছু হয় নি, আজ পর্যন্ত চলে এসেছে সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত। আমরা আগে দেখেছি সপ্তদশ শতাব্দের পাদরী আশার সাহেবের হিসাবে পৃথিবীর সৃষ্টি মাত্র খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০৪ সালে, তাঁর এক কাঠি উপরে উঠে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ জন লাইট্‌ফুট দিন ক্ষণ পর্যন্ত জানিয়ে দেন—

২৩ অকটোবর সকাল ন'টায়। সপ্তদশ শতাব্দের মধ্যাংশে ৪004 খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পৃথিবীর জন্ম তারিখ রূপে জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও আগেও ওরই কাছাকাছি তারিখ প্রচলিত ছিল, শেক্‌সপিয়ার লিখে গেছেন As You Like It নাটকে : "The poor world is almost 6000 years old"। যাই হক, ক্রমে এই সব ধারণা এমন বদ্ধ বিশ্বাসে অনড় হয়ে পড়ল যে এদের প্রতি সন্দেহ হয়ে দাঁড়াল অধার্মিকতা।

আমাদের পুরাণে বরং আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে বেশী মিল দেখতে পাই :

স্থাবরং বিংশতের্লক্ষং জলজং নবলক্ষকম্।
কূর্ম্মাশ্চ নবলক্ষং চ দশলক্ষং চ পক্ষিণঃ॥
ত্রিংশলক্ষং পশূনাঞ্চ চতুর্লক্ষং চ বানরাঃ।
ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃ কর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥
(বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ)

কত জন্ম পার হয়ে শ্রেষ্ঠ জন্ম মনুষ্যত্ব লাভ করতে হয় তার হিসাব। প্রাণী কুলের শ্রেণীবিভাগ লক্ষ্য করবার বিষয়—জীবাণু প্রমুখ অচেতন প্রাণীর থেকে আরম্ভ করে জলচর, সরীসৃপ, পাখি, পশু (স্তন্যপায়ী) এবং একেবারে শেষে বানর—ঠিক আধুনিক প্রাণী বিদ্যার যেমন বিন্যাস! শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন প্রাণীর সংখ্যা খুব যথার্থ না হতে পারে কিন্তু সব যোগ করলে যা দাঁড়ায়, অর্থাৎ এ পর্যন্ত যত প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে তার অঙ্কটা (যা সঠিক ভাবে জানা নেই এবং সম্ভবত কখনও জানা সম্ভব নয়) হয়তো খুব আজগুবী নয়।

ভেবে দেখতে গেলে ক্রমবিকাশ ব্যাপারটা এতই বিস্ময়কর, জীবাণুর থেকে তিমির উদ্ভব আপাতদৃষ্টিতে এতই অকল্পনীয় যে তা যে কোনও দেশের সৃষ্টিপুরাণেই স্থান পায় নি সেটা কিছু আশ্চর্য নয় ; প্রাচীন জিজ্ঞাসুদের মনে সবচেয়ে সহজে জেগেছে এক দৈব শিল্পীর ছবি, সব প্রাণীদের যে গড়েছে প্রায় একই সঙ্গে। বাইবেলে প্রথম দিনে গাছপালা দিয়ে সৃষ্টি শুরু, ষষ্ঠ দিনে মানুষ দিয়ে তা শেষ।

যাই হক, অভিব্যক্তিবিরোধী গোঁড়া বিশ্বাসের গোড়ায় য়োরোপে সবচেয়ে বড় ঘা মেরেছে ফসিলের মূক অকাট্য যুক্তি। যদিও ডারুইনের শুধু একটি প্রাচীন মানুষ (নেআন্ডার্টাল মানব) ও একটি লুপ্ত বনমানুষের (ড্রায়োপিথেকাস) অস্থি জানা ছিল, অন্যান্য অজানা প্রাণীর হাড় নানা জায়গায় দেখা দিয়েছে। এক দিকে জলচর প্রাণীর ফসিল স্থলে বসে এক বিশ্রী সমস্যার সৃষ্টি করেছে, অন্য দিকে এমন সব হাড়গোড় পাওয়া যাচ্ছে যা আজকের কোনও জন্তুর দেহে খাটে না। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ

ভাগে ইটালিতে খাল কাটতে কাটতে বার হল সামুদ্রিক শামুক জাতীয় বহু খোলক, বিখ্যাত শিল্পী-বিজ্ঞানী লেওনার্দো ডা ভিন্‌চি তার থেকে সিদ্ধান্ত করলেন জায়গাটি একদা ছিল সমুদ্র গর্ভে। তারও অনেক আগে এক গ্রীসীয় পণ্ডিত পাহাড়ের উর্ধ্ব দেশে ফসিল পেয়ে ঐ রকম কথাই বলেছিলেন— তাঁর নাম জেনোফেনিস, জন্ম খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের শেষে। কিন্তু পরে তাঁরই দেশবাসী এবং প্রসিদ্ধতর পণ্ডিত অ্যারিসটট্‌ল জানালেন ফসিলের উৎপত্তি ঐ পাথরেরই থেকে। পরবর্তী কালে এমন মতও শোনা গিয়েছে যে ফসিল মহাকাশ থেকে উলকার মত এসে পড়েছে পৃথিবীতে, অথবা তাদের বীজ উড়ে এসেছে তারার থেকে। আর ম্যামথ বা অন্যান্য অবলুপ্ত জন্তুর হাড়—ও সব হল দানবের কঙ্কাল।...এ ধরনের কথা যাদের একটু আজগুবী মনে হল তাঁরা ফসিলের প্রতি চোখ বন্ধ করে রইলেন মাত্র। কিন্তু ফসিলের নজির এত বাড়তে লাগল, এত জরুরী হয়ে উঠল তাদের নীরব প্রশ্ন যে শেষ পর্যন্ত ছাড়তে হল অপরিবর্তিত, অপরিবর্তনীয় সৃষ্টির ধারণা—মানতে হল ক্রমবিকাশ বা evolution (শব্দটির গোড়াতে আছে ল্যাটিন ক্রিয়া evolvere, যার অর্থ ক্রমশ উনমোচন করা, বাংলায় এই অর্থে অভিব্যক্ত, উৎক্রান্তি, উদ্‌বর্তন, বিবর্তন ইত্যাদি শব্দও ব্যবহার হয়েছে।)

ক্রমবিকাশবাদ এক দিনের বা সম্পূর্ণ এক জনের আবিষ্কার নয় ; ডারুইনের আগে সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দে যাঁরা তাঁর পথ পরিষ্কার করেছেন, অথবা ফাঁক ভরেছেন, তাঁদের সঙ্গেও সংক্ষেপে পরিচয় করা দরকার। ডা ভিন্‌চির সূত্র ধরে ফ্রান্‌সে দ মেইয়ে পাহাড়ের গায়ে ফসিল দেখে অনুমান করলেন যে কোনও দূর কালে সমুদ্র ছিল সেখানে, সুতরাং পৃথিবী সুপ্রাচীন। তাঁরই দেশবাসী মোপের্ত্যুই বলেছিলেন যে এই বৈচিত্র্যময় প্রাণী জগৎ একই অভিন্ন সূত্রের থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকতে পারে। তেমনি প্রজাতির মধ্যে যে কিছুটা বিভেদ ঘটে থাকে সপ্তদশ শতাব্দীতেই তা মেনেছিলেন প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরা, এবং এরই সুযোগ নিয়ে পশুপালনে কৃত্রিম নির্বাচনও ব্যবহার হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই। সুইডেনের বিখ্যাত পণ্ডিত ও প্রাণী কুলের শ্রেণীবিভাগের প্রধান উদ্যোক্তা কারোলাস লিনিয়াস প্রজাতির অপরিবর্তনীয়তা সম্বন্ধে কিছুটা সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, যদিও জোর করে কিছু বলেন নি। প্রাণীবিজ্ঞানের ইতিহাসে ফরাসী জীববিজ্ঞানী জর্জ ব্যুফঁ মস্ত বড় নাম ; কোনও কোনও প্রাণী যে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে ফসিলের সাক্ষ্য থেকে তা তিনি মানলেন, প্রভূত তথ্য সংগ্রহ করলেন যাতে প্রাণীর থেকে প্রাণীর উদ্ভব প্রতীয়মান হয়, তবু শেষ পর্যন্ত ক্রমবিকাশ অস্বীকার করলেন। প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের

প্রভাব যে কতখানি প্রবল হতে পারে এ তারই দৃষ্টান্ত।

এর পরে চার্লস ডারুইনের পিতামহ ইরাস্‌মাস ডারুইন ও ফরাসী বিজ্ঞানী শেভালিয়ে দ লামার্ক (১৭৪৪-১৮২৯) ক্রমবিকাশ তত্ত্বের দিকে অনেকটা এগিয়ে এলেন। এই তত্ত্বের গোড়াতে দুটি মৌলিক সর্ত মানতে হয়—প্রজাতির পরিবর্তনে প্রজাতির সৃষ্টি, এবং এই পরিবর্তন-সংগত পৃথিবীর বয়স। ইরাসমাস এই বয়স ধরলেন কয়েক লক্ষ বছর। লামার্কের নামের সঙ্গে জড়িত যে মতবাদ নিয়ে সে দিন পর্যন্ত বিতর্ক চলেছে তা হল এই যে প্রাণীরা জীবন কালে অভ্যাসের ফলে দৈহিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করে এবং সেগুলি তাদের সন্তানে বর্তায়; কথাটি সত্য না হলেও এর স্পষ্ট নির্দেশ পরিবর্তনের দিকে, এবং এই প্রথম ক্রমবিকাশের এক ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। লামার্কের মতে কোনও বিশেষ অবস্থায় পড়ে প্রাণীর কোনও অঙ্গ বেশী ব্যবহার হবে, কোনও অঙ্গ কম, সন্তানে সেই ব্যতিক্রম প্রতিফলিত হবে, এমনি করে ধীরে ধীরে প্রজাতির চেহারা বদলাবে। (কথাটা একটু বদলে ব্যুফ' বললেন, অঙ্গের পরিবর্তন আসে ব্যবহারের পথে নয়, আবহাওয়া ও পারিপার্শিক অবস্থার প্রত্যক্ষ প্রভাবে।) লামার্কের এই ধারণাও ছিল যে যে সব প্রাণীকে আমরা বিলুপ্ত ভাবি তারা আসলে নতুন প্রাণীতে পরিণত হয়েছে।

পৃথিবীর ইতিহাসের সঙ্গে প্রাণের ইতিহাসের যোগ যে অন্তরঙ্গ তার ইঙ্গিত আমরা আগে পেয়েছি, সুতরাং ভূবিজ্ঞান ও প্রাণীবিজ্ঞানের মধ্যে সর্বদা সমন্বয় সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে, একটা আর একটার চিন্তাধারাকে প্রভাবান্বিত করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে প্রথম ক্ষেত্রে দেখা দিল বিপ্লববাদ, এবং তারই সূত্র ধরে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রগতিবাদ; অর্থাৎ এই ধারণার উৎপত্তি যে পৃথিবীর ইতিহাসে পর পর কয়েকটি বিপ্লব ঘটে গিয়েছে এবং তার ফাঁকে ফাঁকে নতুন করে উন্নত থেকে উন্নততর প্রাণী কুলের সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর গায়ে সবচেয়ে নিচের স্তরটি সে সবচেয়ে প্রাচীন এই গুরুতর তথ্যটি ঘোষণা করলেন উইলিয়াম স্মিথ (১৭৬৯-১৮৩২)। জার্মেনির ভের্নের বললেন যে আদিম সর্বপ্লাবী মহাসাগর ক্রমশ সরে গিয়ে একের পর এক স্থল স্তর উদঘাটন করেছে, সেখানে এক এক শ্রেণীর প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে যেমন বাইবেলে বলেছে সেইরকম (জল সরে কোথায় গেল তা কিন্তু বলা হল না)। বিখ্যাত ফরাসী ফসিল-বিজ্ঞানী জর্জ ক্যুভিয়ে (১৭৬৯-১৮৩২) জানালেন বাইবেলে যে সৃষ্টির কথা লেখা আছে তার আগে তিনটি বিপ্লব এসে গিয়েছে, সব শেষেরটি নোআর বিখ্যাত মহাপ্লাবন; ফাঁকে ফাঁকে সৃষ্টি হয়েছে মাছ, সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী পশু, মানুষ। বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও ধর্মমতের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টির চেষ্টা এই সব তত্ত্ব। এর সুযোগ নিয়ে সনাতনপন্থীরা বললেন যে মানুষেরই আদর্শের

দিকে সৃষ্টি ক্রমে এগিয়ে এসেছে, তারই জন্য সব আয়োজন (ধর্মযাজকদের যখন জিজ্ঞাসা করা হত মানুষের শত্রু উকুন বা বিছে কেন সৃষ্টি হয়েছে তখন তাঁরা খুব সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেন নি)। অধুনালুপ্ত কোনও সরীসৃপের পায়ের ছাপের সঙ্গে মানুষের পায়ের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে কেউ বা তার মধ্যে দেখলে 'আগামী কালের পদচিহ্ন'। এই ধরনের বিপ্লববাদ বা প্রগতিবাদ এখন গ্রাহ্য নয় বটে, কিন্তু ক্রমবিকাশের বর্তমান ধারণায় দুইয়েরই ছাপ আছে ; যথা আজ যে আমরা কয়েকটি ভৌগোলিক বিপ্লবের ইতিহাস জানি সেগুলি প্রাণী কুলের মধ্যে মধ্যে সম্পূর্ণ দাঁড়ি না টানলেও প্রজাতির অভিব্যক্তিতে এদের প্রভাব অসামান্য।

এই ধরনের সীমিত ভৌগোলিক বিপ্লবের কথা প্রথমে বলেছিলেন জেম্স হাটন (১৭২৬-৯৭)। তিনি প্রচার করলেন যে পৃথিবীর অন্তর্গত তাপের প্রভাবে মাঝে মাঝে তার বহির্ভাগ ঠেলে উঠেছে, আবার নেমে এসেছে ভূমিক্ষয়ের ফলে, কিন্তু এতে প্রাণসূত্রে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটে নি কখনও ; মহাপ্লাবনও আসে নি কোনও দিন। হাটন সময়কে সীমামুক্ত করলেন, বহু দূর অতীতে ছড়িয়ে পড়ল মহাকাল, যেমন দেখা যায় প্রাচ্য দর্শনে। আশ্চর্য নয় যে তাঁকে অধার্মিকতার অভিযোগ দেওয়া হল, যদিও আজ তিনি ঐতিহাসিক ভূবিজ্ঞানের জন্মদাতা বলে মান্য। প্রগতিবাদের বিরুদ্ধ তত্ত্বটি যে গড়ে উঠেছে—যাতে বলে সবই ঘটেছে প্রাকৃতিক শক্তির ঘাত প্রতিঘাতে, ঐশ্বরিক কিছু ভাববার দরকার নেই—তার মধ্যেও হাটনের ছায়া রয়েছে।

সীমাহীন সময়ের পটে প্রাকৃতিক শক্তির খেলা—সৃষ্টির এই ছবিটি আবার নতুন করে তুলে ধরলেন চার্লস লায়াল (১৭৯৭-১৮৭৫), যাঁর প্রভাবে গড়ে উঠেছিল তরুণ ডারুইনের মন। লায়াল বুঝেছিলেন বটে যে স্থানীয় অবস্থার বিপাকে কোনও প্রাণী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, কিন্তু প্রাকৃতিক নির্বাচনের সৃষ্টিকারী দিকটা তাঁকেও এড়িয়ে গেল। আবিষ্কারের পরে সত্যকে সহজ মনে হয়, আগে অন্ধকারে হাতড়াতে হয় অনেক দিন ; যে জীবন সংগ্রামের উপর ডারুইন এতখানি জোর দিয়েছেন তা অষ্টাদশ শতাব্দীতেই জানা ছিল ('বড় খায় ছোটকে, ছোট খায় আরও ছোটকে'), কিন্তু সৃষ্টির আড়ালে উদ্দেশ্যের ধারণা মানুষের মনকে এতখানি জুড়ে বসেছিল যে সংগ্রামের প্রভাব ধরা হয়েছে সামান্য বলে। এমন কি লামার্কবাদকেও বিকৃত করে বিজ্ঞানী, লেখক ও দার্শনিকরা উদ্দেশ্যবাদী বা উদ্যোগবাদী তত্ত্ব অনেক প্রচার করেছেন, আজও করছেন। আর একটি দৃষ্টান্ত—বহু কাল কৃত্রিম নির্বাচন ব্যবহার করেও এ কথাটা ধরা পড়ে নি যে প্রকৃতিও ঐ একই নীতি অনুসারে কাজ করে।

ডারুইনের প্রতিভা এইখানেই প্রতীয়মান। ক্রমবিকাশের স্বপক্ষে যা জানা ছিল এবং নিজের চোখে যা দেখেছেন পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ দ্বীপান্তরে ভ্রমণ কালে, তার থেকে তিনি গড়ে তুললেন এক সুসংবদ্ধ তত্ত্ব, এবং তার ব্যাখ্যায় প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রকৃত মূল্য ধরা পড়ল তাঁর চোখে। তা ছাড়া ডারুইনকে বিশেষ ভাবিয়েছিল ইংরেজ পাদরী টমাস ম্যাল্‌থাস (১৭৬৬-১৮৩৪) রচিত বিখ্যাত প্রবন্ধ যাতে দেখানো হয়েছে খাদকের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্য তাল রাখতে পারে না, সুতরাং প্রতিযোগিতা অনিবার্য। ডারুইনের অব্যবহিত আগে আরও জন কয়েক সবটাই দেখেছিলেন অস্পষ্ট, শুধু তাঁর দেশবাসী অ্যালফ্রেড ওআলেস (১৮২৩-১৯১৩) সমান গৌরবের অধিকারী। ১৮৫৮ সালে প্রশান্ত মহাসাগরের এক দ্বীপে জ্বরের ঘোরে হঠাৎ প্রাকৃতিক নির্বাচনের ধারণাটি স্পষ্ট খেলে তাঁর মাথায়, এবং সেই বছরই এঁরা দু জনে একযোগে ক্রমবিকাশবাদ দাখিল করেন এক বৈজ্ঞানিক সমিতির কাছে। পরের বছর প্রকাশিত হল ডারুইনের বই। জীব জগতে পরিবর্তনের রহস্যটি সম্পূর্ণ নতুন রূপে দেখা দিল এবং ফলে প্রগতিবাদের গায়ে দারুণ আঘাত লাগল।

প্রাকৃতিক নির্বাচন ও লামার্কবাদের মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে কোনও এক অবস্থায় যদি লম্বা লেজ বেশী কার্যকর হয় তা হলে লামার্কের মতানুসারে ব্যবহারের ফলে লেজ বড় হবে এবং তা সন্তানে বর্তাবে। পক্ষান্তরে প্রাকৃতিক নির্বাচন বলে যে যাদের লেজ অপেক্ষাকৃত বড় তারাই জীবন সংগ্রামে জিতবে এবং ক্রমশ ক্ষুদ্র-লাঙ্গুলাধিকারীরা নিশ্চিহ্ন হবে। কিন্তু প্রজাতির অন্তর্গত এই প্রকার বিভেদের কারণটা তখনও জানা ছিল না, সুতরাং বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে ডারুইনের ধারণাতেও শেষ পর্যন্ত কিছুটা অস্পষ্টতা থেকে গিয়েছে—কখনও বা লামার্কবাদও তিনি ব্যবহার করেছেন প্রাকৃতিক নির্বাচনের পাশাপাশি। "আদর্শের দিকে অগ্রগতি" কথাটা তিনিও লিখেছেন এক জায়গায়।

ডারুইন ভেবেছিলেন বাইরের অবস্থার প্রভাবে দেহের অন্তর্গত জনন-কোষের পরিবর্তন হয়, কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বটি প্রকাশ করেন অস্ট্রিয়াবাসী এক অখ্যাত সন্ন্যাসী, নাম গ্রেগর মেন্‌ডেল (১৮২২-৮৪)। বীজকোষের মধ্যে বিবিধ পৃথক বংশকণিকার অস্তিত্ব এবং তাদের অদল বদলে দৈহিক বিশেষত্বের পরিবর্তন তিনিই আবিষ্কার করলেন, কিন্তু যদিও এই আবিষ্কার প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৫ সালে (ডারুইনের জীবন কালেই) তথাপি ৩৫ বছর তা অবজ্ঞার অন্ধকারে থেকে গেল। ওলন্দাজ বিজ্ঞানী হুগো ডে ভ্রীস (১৮৪৮-১৯৩৫) প্রস্তাব করলেন যে একমাত্র আকস্মিক পরিবর্তনের পথেই

ক্রমবিকাশ কাজ করে, এই ভাবেই হঠাৎ প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে, ডারুইনের কল্পনা অনুযায়ী প্রায়-অদৃশ্য পদক্ষেপে নয়। বংশকণিকার আকস্মিক পরিবর্তন বা মিউটেশন আজ অবিসংবাদিত সত্য এবং ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যা এই দিয়েই সম্পূর্ণ হয়েছে।

প্রাকৃতিক নির্বাচন উপলব্ধি করবার পরে ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে সব প্রশ্ন যে মিটে গিয়েছে তা নয়। সবার উপরে যে মানুষ তার মন ও চেতনার ঐতিহাসিক বিকাশে এখনও অনেক রহস্য। যথা, গানের ক্ষমতা বা সাধারণ সৌন্দর্য বোধ সে কেন লাভ করল আমরা জানি না—কোনও জীবন সংগ্রামে তা তাকে সাহায্য করেছে তা ভাবতে পারি না। কিন্তু এই সূক্ষ্ম দিকগুলি ছেড়ে দিলে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের উজ্জ্বল আলোয় জীব সৃষ্টির রহস্য প্রায় সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হল।

তবে বহু শতাব্দীর বদ্ধ ধারণা সহজে মরে নি, নতুন বিশ্বাসের প্রতি চির দিন মানুষের স্বাভাবিক বিদ্বেষ ও সন্দেহ। পৃথিবী জ্যোতির্মণ্ডলের কেন্দ্র নয়, সে যে সূর্যকে পরিক্রমণ করে এটা মানতে যে কারণে কষ্ট হয়েছিল ঠিক সেই কারণেই মানুষকেও পৃথিবীর বিশেষ সৃষ্টি, অন্যান্য প্রাণীদের নিয়মের বাইরে বলে ভাবতে ইচ্ছা করে। সামান্য জীবাণুর থেকে অতিকায় তিমি বা হাতির বিকাশ ঘটেছে প্রাকৃতিক নির্বাচনের পথে তা বরং বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষও যে সেই পথের পথিক হতে পারে তা কল্পনার অতীত। তাও কিনা মানতে হবে যে ঐ নোংরা বানর কুলে তার জন্ম! ইতর প্রাণীদের নিয়ম মানুষের জন্য হতে পারে না, তার উদ্ভব অলৌকিক বা আকস্মিক এমন কথা বললেন অনেকে। তা ছাড়া বাইবেল বলেছে ঈশ্বর নিজের মূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

যাঁরা এ ধরনের যুক্তি দিয়েছেন তাঁরা সবাই যে গোঁড়া ধর্মযাজক বা শিক্ষক সমাজের লোক তা নয়, তাঁদের মধ্যে অনেক বিজ্ঞানীও ছিলেন—তবে তাঁরা ধর্মবিশ্বাস ও বিজ্ঞানের শিক্ষা আলাদা আলাদা বাক্সে ভরে রাখতে জানতেন। কিন্তু ডারুইনের সমর্থক যে কেউ ছিল না তাও নয়, তাঁর এক বিখ্যাত ভক্ত ছিলেন টি এইচ হাক্সলি (জীববিজ্ঞানী জুলিয়ান ও সাহিত্যিক অল্‌ডাসের পিতামহ), নিজেকে তিনি বলতেন 'ডারুইনের বুলডগ'। একদা এক সভায় জনৈক বিশপ উঠে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন বানরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক পিতৃপক্ষের না মাতৃপক্ষের ; এ প্রশ্নের কোনও সোজা জবাব না দিয়ে হাক্সলি বললেন, "এক দিকে এক বেচারা নির্বোধ জন্তু যে নিচু হয়ে চলে আর আমাদের দেখে দাঁত কেলিয়ে আবোল তাবোল বকে, আর অন্য দিকে প্রভূত দক্ষতা ও সম্ভ্রমের অধিকারী মানুষ, যে সেই অধিকার ব্যবহার করে সামান্য সত্যান্বেষীদের অপমান ও সর্বনাশ করতে—এ

বিতর্ক, অন্যান্য দেশও বাদ যায় নি এবং আজও তার জের মেটে নি ডারুইনের বিস্ফোরক বইটির পর ১২৫ বছর হতে চলল, তার প্রস্তাব এখন আর তত্ত্ব নয়, দৃঢ় সত্য, আশ্চর্য এই যে তবু সভ্য দেশে দেশে এখনও অনেকে উপরোক্ত প্রাচীন বিশ্বাসগুলি আঁকড়ে আছে। ১৯২৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি প্রদেশে জন স্কোপ্‌স নামক এক তরুণ শিক্ষক স্কুলে অভিব্যক্তিবাদ শিখিয়েছিলেন বলে অভিভাবকরা ভীষণ ক্ষেপে মামলা করলেন। শিক্ষকের জরিমানা হল কারণ প্রাদেশিক আইনে বাইবেলের কাহিনী ছাড়া অন্য কোনও সৃষ্টি তত্ত্ব শেখানো নিষিদ্ধ ছিল। এই ঘটনা 'বানরী বিচার' আখ্যা পেয়ে এবং শহরটি 'বানরপুরী' নামে ইতিহাসে কুখ্যাত হয়ে আছে। আইনটি মাত্র ১৯৬৭ সালে প্রত্যাহৃত হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য প্রদেশে একই আইন নাকচ করতে এক বিবাহিতা তরুণীকে দেশের চরম আদালত পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। সম্প্রতি আবার যুক্তরাষ্ট্রের কোনও কোনও প্রদেশে আইন হয়েছে স্কুলে অভিব্যক্তিবাদের পাশাপাশি বিকল্প সম্ভাবনা রূপে বাইবেল কাহিনীও শেখাতে হবে—মার্কিন রাষ্ট্রপতি রনাল্‌ড রেগানও এই শিক্ষা রীতির সমর্থন করেন।

ডারুইনকে ঘিরে বাদানুবাদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু ভুলে গিয়েছিল যে বানরকে নরের পিতামহ বলা হয় নি, জ্ঞাতির স্থান দেওয়া হয়েছে মাত্র। মানুষ ও বনমানুষের শাখা দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন, যদিও পূর্বপুরুষ এক (সম্পর্ক যাই হক, তা যে অত্যন্ত নিকট তা তাদের বাংলা নামেই প্রতীয়মান)। এখানে বলা যেতে পারে যে জীব কুলের ক্রমবিকাশের গতি সরল স্তম্ভের মত নয়, বরং বহু শাখাযুক্ত কোনও তরুর সঙ্গে তার তুলনা চলে। প্রধান কাণ্ডের গোড়ার কাছ থেকেই এ গাছের শাখা ছড়িয়ে পড়েছে চার দিকে—তাদের কারও প্রশাখা বেশী, কারও কম, কেউ আকাশের দিকে উঠতে উঠতে পথ হারিয়ে থেমেছে, কেউ মরেছে, কেউ বা আজও বেড়ে চলেছে। এমনি স্তন্যপায়ীদের শাখাটি বেশ বড়, গাছের প্রায় মাথার কাছে তার থেকে এক প্রশাখার উদগম হল, তার নাম প্রাইমেট (অর্থাৎ প্রধান স্থানীয়), এর থেকে আবার যে সব ডাল বেরিয়ে গেল সেখানে আমাদের পরিচিত বিভিন্ন বানর ও বনমানুষের স্থান—আর তাদের জন্মের অনেক পরে প্রধান প্রাইমেট প্রশাখার একেবারে শেষে মানুষের উৎপত্তি। গাছের এই ডালটিই আজ আকাশের সবচেয়ে কাছাকাছি।

সেই যে এক রকম খেলা আছে যাতে ছকের একেবারে নিচ থেকে ঘুঁটি চলতে শুরু করে উপর দিকে, ডাইনে বাঁয়ে অনেক অন্ধগলিতে গিয়ে পথ হারায়, কেউ বা অন্যকে পিছনে ফেলে উপর দিকে এগিয়ে যায়, কেউ বা অন্ধগলিতেই মারা পড়ে, শেষ পর্যন্ত এক একটি হয়তো একেবারে লক্ষ্যে পৌঁছায়—মনে হয় জীবের অভিব্যক্তির খেলা অনেকটা সেই

দুইয়ের মধ্যে কার বংশধর হতে চাই তা যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তো কি যে বলব

চিত্র ৫। ১৮৭১ সালে এক পত্রিকায় প্রকাশিত ডারুইনের এই নির্মম ব্যঙ্গচিত্রে তাঁকে "শ্রদ্ধেয় ওরাং ওটাং" আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

ঠিক জানি না।" এর চেয়ে আরও কটূ অনেক কথার গোলাগুলি চলেছিল দেশজোড়া সেই বাক্‌যুদ্ধে, যার আখ্যা দেওয়া হয়েছিল 'বানর বনাম দেবদূত' বিতর্ক। ১৮৬৪ সালে ইংলনডের প্রসিদ্ধ নেতা ও ভাবী প্রধান মন্ত্রী ডিজ্‌রেলি বললেন, "মানুষ উল্লুক না দেবদূত? আমি অন্তত দেবদূতের দলে।" যদিও প্রধানত ইংলনডেই জমে উঠেছিল এ

চিত্র ৬। জীব কুলের অভিব্যক্তি।

রকম। এমনি করেই কোটি কোটি বছর ধরে প্রকৃতি পরীক্ষা চালিয়েছে, যেখানে ভুল হয়েছে সেখানে কোনও মায়া না করে তা ত্যাগ করে অন্য দিকে মন দিয়েছে। কোনও কোনও ভাবুক এমন কি বিজ্ঞানীও এর মধ্যে দেখেছেন এক অনবদ্য আদর্শের দিকে অগ্রগতি, অন্যদের চোখে এই খেলা শুধু বস্তু জগতের অবস্থা বিন্যাসের অনিবার্য ফল মাত্র।

৪। জীবাণু থেকে তিমি

প্রাণের উন্মেষ থেকে জীব কুল কোন পথে হীন থেকে উন্নত, ক্ষুদ্র থেকে বৃহতের দিকে এগিয়েছে, অভিব্যক্তি তরুর শাখা প্রশাখায় কি কি মূর্তি নিয়েছে, কখন কার আবির্ভাব বা বিদায় এ বার আমরা সে দিকে দৃষ্টি দিতে পারি। যত কাল পৃথিবীতে প্রাণ আছে তত দিন চলবে এই বিশাল মিছিল, আমরা এখানে শুধু নাটকের প্রধান অঙ্কগুলির উল্লেখ করতে পারি যা ভবিষ্যতের দিক নির্ণয় করেছে। কিন্তু এই বিচিত্র মিছিলের সঙ্গে পরিচয় করার আগে ভূবিদ্যা ও জীববিদ্যার কাল বিভাগ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার, কারণ পৃথিবীর ইতিহাস ও জীব কুলের বিকাশের মধ্যে নিকট সম্পর্ক, আবহাওয়া, ভৌগোলিক বিন্যাস ইত্যাদির প্রভাবেই উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতে উত্থান পতন ঘটেছে।

ইতিপূর্বে যে তিনটি ভৌগোলিক বিপ্লবের কথা বলা হয়েছে মোটামুটি সেই সময়টা জুড়ে তিন অধিকল্প (era)—পেলিওজোইক (palaeozoic) বা পুরাজীবীয়, মেসোজোইক (mesozoic) বা মধ্যজীবীয় এবং সিনোজোইক (cenozoic) বা নবজীবীয়। ভূতত্ত্ব বা শিলার ভিত্তিতে এই ৬০ কোটি বছরে আছে ১১ কল্প (period)—পুরাজীবীয় অধিকল্পের শুরুতে ক্যাম্ব্রিয়ান কল্প থেকে নবজীবীয়ের টার্শারি ও বর্তমান কোআটার্নারি পর্যন্ত। এই দুই কল্পের অর্থাৎ নবজীবীয় অধিকল্পের আবার সাত অধিযুগ (epoch)—প্রাচীনতম পেলিওসিন থেকে সবচেয়ে সাম্প্রতিক প্লাইস্টোসিন (pleistocene) ও হলসিন (holocene) পর্যন্ত (চিত্র ৭)। মোটামুটি এই দুটির সঙ্গে মেলে প্রত্নবিজ্ঞানীদের দুই যুগ (age) পেলিওলিথিক (palaeolithic) ও নিওলিথিক (neolithic) অর্থাৎ পুরাপ্রস্তর ও নবপ্রস্তর যুগ (lith = পাথর); মানুষের প্রাগিতিহাসে এ দুটি নামই বেশী ব্যবহার হয়।

পৃথিবীর বয়স অনুসারে পুরাজীবীয়ের আগে দুটি প্রাক্-ক্যামব্রিয়ান অধিকল্পের উল্লেখ করা হয়—অজীবীয় (azoic) এবং আদিজীবীয় (archaeozoic), দুটিতে মিলে প্রায় ৪০০ কোটি বছর। এর মধ্যে কোনও এক সময়ে দেখা দিল প্রাণ, আমরা দেখেছি তা পৃথিবীর জন্মের ১০০ কোটি বছরের মধ্যেই ঘটে থাকতে পারে। ৩৫০ কোটি বছর আগে ছিল একটি মাত্র ভূখণ্ড বা অতিমহাদেশ, স্থল বলতে তখন শুধু পাথর, এই গ্রহের বাকি

মহাকল্প	কল্প	অধিযুগ	বছর আগে	বৈশিষ্ট্য
নবজীবীয়	কোয়াটার্নারি	হলসিন		কৃষি, পশুপালন
			১০,০০০	
		প্লাইস্টোসিন		মানুষ
			২০ লক্ষ	
	টার্শারি	প্লায়োসিন		নররূপী বনমানুষ
			১ কোটি	
		মায়োসিন		
			২½	
		অলিগোসিন		বানর, বনমানুষ
			৪	
		ইয়োসিন		
			৬	
		পেলিয়োসিন		প্রথম প্রাইমেট (প্রোসিমিয়ান)
			৭	
মধ্যজীবীয়	ক্রিটেশাস			শেষ ডাইনোসর প্রথম ফুলগাছ
			১৩½	
	জুরাসিক			প্রথম পাখি
			১৮	
	ট্রায়াসিক			প্রথম স্তন্যপায়ী প্রথম ডাইনোসর
			২২½	
পুরাজীবীয়	পার্মিয়ান			
			২৭	
	কাবরনিফেরাস			কয়লা বন প্রথম সরীসৃপ প্রথম কীট পতঙ্গ
			৩৫	
	ডিভোনিয়ান			প্রথম উভচর প্রথম স্থলের প্রাণী (মাকড়সা জাতীয়) প্রথম বন কঠিন অস্থিযুক্ত মাছ
			৪০	
	সিলুরিয়ান			প্রথম স্থলের জীব (উদ্ভিদ) চোয়ালযুক্ত মাছ
			৪৪	
	অর্ডোভিসিয়ান			প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণী (কঠিন বর্মাবৃত চোয়ালহীন মাছ)
			৫০	
	ক্যাম্ব্রিয়ান			খোলকাবৃত প্রাণী (মেরুদণ্ডহীন)
			৬০	
অজীবীয় ও আদিজীবীয়	প্রাক্-ক্যাম্ব্রিয়ান		১০০	বায়ব প্রাণী (animal) প্রথম বহুকোষ উদ্ভিদ
			৩৫০	প্রথম এককোষ জীবাণু (ব্যাক্টিরিয়া, শেওলা)
			৩৭৬	আদিতম জানা পাথর
			৪৬০ কোটি	পৃথিবীর সৃষ্টি

চিত্র ৭। পৃথিবীর কাল বিভাগ ও জীব কুলের উদ্ভব। (বিভাগীয় সীমা সম্বন্ধে কিছু মতভেদ দেখা যায় ; প্রাক্-ক্যাম্ব্রিয়ান তারিখ অনেকটা আনুমানিক ; কারও কারও মতে মানুষের জন্ম ৩০-৩৫ লক্ষ বছর আগে।)

দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে সাগর। তার জলে প্রথমে এককোষ জীবাণু অবায়ুজীবী ব্যাকটিরিয়ার পর ফোটোসিনথেসিসের সাহায্যে আঙ্গারিক গ্যাস কাজে লাগিয়ে পুষ্ট এক কোষেরই ব্যাকটিরিয়া ও শেওলা থেকে প্রাণ উত্তীর্ণ হল উপর তলায়, বহুকোষ অণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ শেওলা ও ছত্রাকের আবির্ভাবে। ফোটোসিনথেসিস-জাত অর্কাসিজেন হয়তো প্রায় ১০০ কোটি বছর ধরে সাগর জলে মিশেছে, সেখানে বেড়ে চলেছে প্রাথমিক উদ্ভিদ কুল। এই জলে প্রথম এককোষ বায়ুজীবী প্রাণীও (animal) দেখা দিয়েছে, আরও অন্তত ১০০ কোটি

চিত্র ৮। ক—প্রাথমিক বহুকোষ উদ্ভিদ শেওলা বা ছত্রাক। খ—প্রাথমিক এককোষ প্রাণী (animal) প্রোটোজোআ দলীয় অ্যামীবা।

বছর ধরে পৃথিবীর পরিমণ্ডলে অর্কাসিজেন জমে ক্রমশ পথ প্রসারিত হল প্রাণী বংশের—এই ভিন্ন জাতীয় যোগ্যতর জীব এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দরজা খুলেছে যার সম্ভাবনা এখনও অফুরন্ত। কিন্তু তার সঙ্গে এই কথাটা মনে রাখা ভাল যে আজ অবায়ুজীবী জীবরা নিতান্ত তুচ্ছ হলেও, অন্ধকার আনাচে কানাচে প্রায় অজ্ঞাত থাকলেও এ যাবৎ পৃথিবী ও প্রাণের ইতিহাসের অধিকাংশ এই হীনরাই অধিকার করে আছে।

প্রথম প্রাণীরা জলের জৈব বস্তুর সঙ্গে অর্কাসিজেন জুড়ে পুষ্টি সংগ্রহ করে, উদ্ভিদ ও নিজেদের খেয়ে অবিলম্বে সাগর ছেয়ে ফেলেছে। আমাদের এই আদিতম অর্কাসিজেন-গ্রাহী পূর্বপুরুষরা বেশ অল্প কালে বৃদ্ধি পেয়েছে একটি কোষ থেকে জটিলতর বিচিত্র প্রাণী কুলে—কেউ সাঁতার কেটেছে খুদে খুদে লেজ চালিয়ে, কেউ নিষ্ক্রিয় ভাসমান, কেউ বা সাগরের মাটি আঁকড়ে স্থির। কিন্তু প্রাক্-ক্যামব্রিয়ান জীবদের অস্থিহীন দেহের ফসিল কিছু নেই, বড়জোর আছে পাথরে তাদের কোমল শরীরের ছাপ, তাই তাদের ধারাবাহিক ইতিহাস খুব স্পষ্ট নয়। ক্যামব্রিয়ান কল্প অর্থাৎ ৬০ কোটি বছর আগে পুরাজীবীয় অধিকল্পের শুরু থেকে ফসিলের সাক্ষ্য অনেক পরিষ্কার ও সুপ্রচুর।

ক্যামব্রিয়ানের সবচেয়ে বেশী ফসিল রেখে গিয়েছে ট্রাইলোবাইটরা, তারা দেখতে কিছুটা গলদা চিংড়ির মত, খোলস পরা ভাগ ভাগ করা দেহ, অপেক্ষাকৃত ছোট প্রাণী
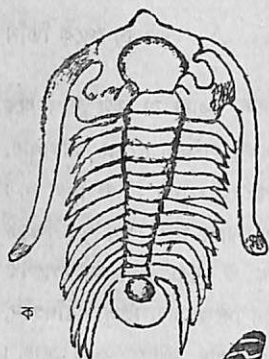
স্থলের পথ দেখিয়ে প্রাণী কুলের ভবিষ্যৎ ক্রমবিকাশের প্রধান দরজা খুলেছে দুটি মাছ যারা আজ প্রায় বিলুপ্ত। প্রথমে এল লাং-ফিশ, বাতাসের অকসি-জেন সংগ্রহের জন্য প্রাথমিক ফুসফুস নিয়ে, তা বাঁচতে সাহায্য করেছে যখন সমুদ্র সরে গিয়ে রেখে গিয়েছে ছোট ছোট অগভীর জলাশয়, অথবা জল শুকিয়ে রয়েছে শুধু কাদা, পৃথিবীর কোথাও কোথাও এরা এখনও এই অবস্থায় বাঁচে। দ্বিতীয় দলের মাছদের পাখনার সঙ্গে মাংসপেশী জোড়া ছিল, তারা শুধু যে নিঃশ্বাসে বাতাস নিত তাই না, এই সব জোরালো পাখনা ঠেলে শুকনো জলাশয় ছেড়ে কষ্টেসৃষ্টে অন্যত্র জলের খোঁজেও গিয়েছে। প্রায় ৩৬ কোটি বছর আগে ক্রমশ এই অঙ্গুলি চলার পক্ষে যোগ্যতর হল, ডিগবাজি না খেয়ে এঁকেবেঁকে তখন গন্তব্যে পৌঁছেছে এই প্রাণীরা, তা ছাড়া তারা আরও বেশী ক্ষণ জলের বাইরে থাকতে পেরেছে। অবশেষে তাদের থেকে দেখা দিল প্রাণী কুলের আর এক নতুন আগন্তুক। ডিম থেকে তার জন্ম জলে, সেখানে শৈশব কাটে মাছের মত, তাদেরই মত জল থেকে ফুলকা দিয়ে অকসিজেন

চিত্র ৯। প্রাচীন কালের বিভিন্ন প্রাণী। ক—ক্যাম্‌ব্রিয়ান কল্পের মেরুদণ্ডহীন জীব প্যারাডক্‌সিডিস, ৫৫ কোটি বছর আগে এরা সাগর তলে চলে বেড়াত, যে সব প্রাণী প্রাচীনতম ফসিল রেখে গিয়েছে তাদের অন্যতম, দৈর্ঘ্য ১০ সেনটিমিটার। খ—প্রকাণ্ড মাংসাশী খোলকপ্রাণী নটিলয়েড, ৪০ কোটি বছর প্রাচীন। গ—২৫ কোটি বছর প্রাচীন উভচর ডিপ্লকলাস, তীরের ফলার মত চ্যাপটা মাথা, প্রাণীটি প্রায় এক মিটার লম্বা।

শুষে নেয় ; কিন্তু এই ব্যাঙাচি অবস্থার শেষে দেখতে দেখতে তার ভোল বদলে যায়— তখন লেজ ও ফুলকা বিলুপ্ত, দু পাশে পা গজায়, স্থলে উঠে আসে সে, ফুসফুস দিয়ে মুক্ত বাতাস নিঃশ্বাসে নিয়ে বাকি জীবন কাটায়, যদিও ডিম পাড়তে হয় জলে। এরা অবশ্য উভচর, বর্তমান দৃষ্টান্ত ব্যাং।

ডিভোনিয়ানের পাঁচ কোটি বছরে উদ্ভিদ, মাছ ও পরিশেষে উভচরদের নিয়ে জীব জগতে এতটা অভিব্যক্তির পর কারবনিফেরাস কল্পের স্যাঁতসেঁতে উষ্ণ জগৎ গাছপালা ও উভচর দুয়েরই অনুকূল হয়েছে। এই সময়ে বন বনানীর বৃদ্ধির তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে আর দেখা যায় না, কোনও কোনও গাছ ৩০ মিটার বা তদূর্ধ্বে মাথা তুলেছে। এই সব বনের দান আজকের বহুমূল্য বস্তু কয়লা, মরা গাছ পচে সহস্র সহস্র বছরের নিদারুণ চাপে তার সৃষ্টি, এর থেকেই কারবনিফেরাস নাম। এই বনে বনে উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে প্রথম খাঁটি কীট পতঙ্গও দলে দলে বৃদ্ধি পেল। তাদের মধ্যে ছিল ৩৮ সেনটিমিটার লম্বা ফড়িং, পাখার বিস্তার ৭৫ সেনটিমিটার। এই দৈত্য পতঙ্গ আজ লুপ্ত, কালের পথ পার্শ্বে বিবর্জিত, তার অসংখ্য সমকালীন জাতভাইদের মধ্যে সবচেয়ে সফল আরসোলা, এখনও পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ঘরে ঘরে তার দৌরাত্ম্য। সে সময়ে আরসোলার ৮০০ প্রজাতি দেখা দিয়েছিল, তার মধ্যে একটির মাপ ১০ সেনটিমিটার।

কিন্তু পোকা মাকড় ছেড়ে আমাদের দৃষ্টি বরং তাদের শত্রু উভচরদের দিকে, এই প্রথম চতুষ্পদরাই আরও এক পা এগিয়ে গেল মানুষ ও প্রাণী কুলের প্রধান অভিব্যক্তির দিকে। এই সময়ে বন বাদাড়ে, জলাভূমিতে, নদী ও হ্রদে নানা দিকে বিশেষত্ব দেখা দিয়েছে তাদের মধ্যে ; তখনও তারা স্থলের চেয়ে জলে বেশী তৎপর, নিয়মিত গা ভেজাতে হয়, লোতজড়ানো ডিম পাড়ে। তার পর কোনও কালে সমুদ্র যখন সংকুচিত হচ্ছে তখন একদা তাদের এক প্রজাতির ডিম কিছুটা শুকনো অবস্থায় পড়েও মরল না, তার এক বংশ-ধরের অণ্ড আরও বেশী সময় শুষ্কতা সহ্য করল। যাদের ডিমের আবরণ একটু শক্ত এবং তার জলের প্রয়োজন আরও কম তারা প্রকৃতির বাছাইতে উত্তীর্ণ হল। এই পথে ক্রমে ডিম দেখা দিল যার খোলসটি ভ্রূণের রক্ষক, যার ভিতরেই জল আর খাদ্য নিয়ে তার বৃদ্ধির ব্যবস্থা আছে। এই খোলস ভেঙে যে বাচ্চা বার হল সে প্রথম থেকেই ফুসফুসে শ্বাস নিয়ে স্থল জীবনের জন্য প্রস্তুত, বাপ মায়ের এই ক্ষুদ্র প্রতিমূর্তি জন্মেই ছুটে পোকা ধরেছে। এই প্রাণীরা উভচর নয়, সরীসৃপ। তাদের মেরুদণ্ড আরও কার্যকর, পা আরও সোজা ও সহজগতি, মগজ আরও উন্নত। কারবনিফেরাসের একটি 'জীবন্ত ফসিল' এখানে উল্লেখযোগ্য ; জীববিজ্ঞানীরা নিঃসন্দেহ ছিলেন ৩০ কোটি বছর প্রাচীন সিলাকান্থ্ মাছ

কিন্তু বিচিত্ররূপী—কারও দশের বেশী চোখ, কারও একটিও না, মাথাটি কারও প্রকাণ্ড, কারও প্রায় নেই। তারা সব আজ লুপ্ত, কিন্তু এই সময়ে শামুক ঝিনুকের মত কঠিন খোলসযুক্ত প্রাণীও ছিল, আর ছিল নানা দল যাদের দেহ ক্রিমি বা স্পঞ্জের মত কোমল ; তারা কোনও ফসিল রেখে যায় নি, কিন্তু আধুনিক বংশধরদের জন্ম দিয়েছে। অর্ডোভিসিয়ান কল্পে পৃথিবী এমন প্লাবনে ডুবেছে যার তুলনা পরে আর দেখা যায় না, সাগরের গভীর শীতল তলে ঘন আঁধারে আবির্ভাব হল এমন সব প্রাণীর যারা উপরের জলের প্রবল চাপ সহ্য করতে পেরেছে, গায়ে আলোর আভা নিয়ে অন্ধকারে যেন লণ্ঠন জ্বেলে চলাফেরা করত তারা। বেশী গভীর জলে অবশ্য উদ্ভিদ বাঁচে না, আলো পায় বলে, উপরে শেওলার প্রকাণ্ড দ্বীপ ভেসে বেড়াত। এই কালের প্রবাল-কীট, ঝিনুক, স্টারফিশ ও সি-আর্চিন আমরা এখনও চিনতে পারি, কিন্তু কিছু কিছু অদ্ভুত প্রাণীও ছিল, যথা অক্টোপাসের আত্মীয় সামুদ্রিক দানব বিকটমূর্তি মাংসাশী নটিলয়েড, তার গায়ে কঠিন খোলের বর্ম সাড়ে চার মিটার পর্যন্ত লম্বা (চিত্র ৯খ)।

সাগরের অন্যান্য বাসিন্দাদের মধ্যে ৪৭ কোটি বছর আগে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আভাস নিয়ে এল নতুন প্রাণী মাছ, তখন আকারে হীন হলেও তারা দেহে মেরুদণ্ড নিয়ে জন্মেছে, এই কাঠামোর উপর ভর করে বৃহত্তর দেহ গড়তে পেরেছে বলেই পরে সব উন্নত প্রাণীর অভিব্যক্তি সম্ভব হয়েছে। পরবর্তী সিলুরিয়ান কল্পের মাছও আকারে ছোট, চোয়ালহীন দাঁতহীন মুখ দিয়ে তারা তলার কাদা থেকে খাদ্য শুষে নিত। তাদের শত্রু ছিল আর এক দানব, প্রায় দু মিটার লম্বা ইউরেপ্টেরিড জাতীয় জলচর কাঁকড়া বিছে, সম্ভবত আধুনিক স্থলবাসী কাঁকড়া বিছেরা তাদেরই বংশধর। সিলুরিয়ান সাগরের এই বৃহত্তম প্রাণী ৪১ কোটি বছর আগে বৈঠার মত লেজ চালিয়ে সামনে মস্ত দুটি দাঁড়া বাগিয়ে করাতের মত মুখ খুলে মাছ তাড়া করে বেড়িয়েছে। তবু কালের কবলে প্রবল শত্রুই নিপাত গিয়েছে আর দুর্বল মাছ শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে আজও টিকে আছে ; তার একটা কারণ এই যে মেরুদণ্ড থাকাতে ক্ষুদ্র মাছেরও সাঁতার ছিল দ্রুত এবং সহজ। তা ছাড়া আগেই তাদের চামড়া মোটা ও হাড়ের মত শক্ত হয়ে বর্ম বানিয়েছে। সিলুরিয়ানের শেষ দিকে উন্নততর মাছ দেখা দিল কামড়াবার উপযুক্ত মুখ নিয়ে, তাদের থেকে পরবর্তী পাঁচ কোটি বছর ধরে প্রকৃতির কর্মশালায় চলেছে মৎস্য কুল নিয়ে পরীক্ষা ও অভিব্যক্তি।

এই সময়ে জীব জগতে এক নব যুগের সূচনা করেছে উদ্ভিদরা যখন তারা সাগরের কূলে কূলে উপনিবেশ স্থাপন করে স্থল অধিকারের পথ দেখাল। ডিভোনিয়ানের আরম্ভে পৃথিবীর গা বার বার ওঠা নামা করেছে, যখন নতুন গিরি শ্রেণী ধীরে ধীরে মাথা তুলেছে,

তার সঙ্গে জল পিছিয়েছে, অপসৃত জল রেখে গিয়েছে কালো কাদা যা যুগ যুগ ধরে জমেছিল সাগরে, তার ঘন স্তর জৈব পদার্থে সমৃদ্ধ। পুষ্টির এমন সুযোগ পেয়ে মোহানায়, হ্রদের ধারে, জলাভূমিতে তরু লতা ছড়াল, কিন্তু আদিম স্থলজদের জীবন সহজ ছিল না। তখনও বীজ দেখা দেয় নি, বংশবৃদ্ধি হত স্পোর দিয়ে, প্রক্রিয়াটা সম্ভব শুধু খুব ভিজে জমি ও যথেষ্ট খাদ্য পেলে। পক্ষান্তরে স্থলের এই আদিম উদ্ভিদরা জল কম পেলেও ফোটোসিনথেসিসের অনুকূল সূর্যালোক পেয়েছে বেশী। প্রথম দিকে তারা ছিল পত্রবিহীন, ক্রমে দেখা দিল সরু পাতা, পরে আরও চওড়া পাতা যা রোদ সংগ্রহ করে ভাল। একই উদ্দেশ্যে গাছ পাশের দিকে ও উপরেও বাড়ল, নিচে মাটিতে নতুন ধরনের শিকড় ছড়াল জল ও পুষ্টির খোঁজে। ডিভোনিয়ানের শেষেই উদ্ভিদ জগতে দ্বিতীয় বৃহৎ অগ্রগতির সূচনা হল স্পোর থেকে বীজের বিকাশে, বীজের ভিতরেই অঙ্কুরের খাদ্য জমা থাকে এবং তার থেকে অঙ্কুরের উদ্গমে অত জল দরকার হয় না। তাই বীজবাহীরা প্রথম থেকেই সফল হয়ে ঘন বন বনানী সৃষ্টি করেছে, যদিও সেই অপুষ্পক তরু লতা আজীবন বর্ণবৈচিত্র্যহীন, একঘেয়ে সবুজ, শুকিয়ে গেলে বাদামী। আর ছিল না ডালে ডালে পাখির গান, অবশ্য ফুল বা পাখির অভাবে দুঃখ করবার মত কবিও ছিল না কেউ। কিন্তু উদ্ভিদ পরিবারে বৈচিত্র্য ছিল আকার আয়তনে—কেউ ভূমিসংলগ্ন, উচ্চতা এক মিটারও নয়; ৪০ কোটি বছর প্রাচীন ৩৫ সেনটিমিটার উঁচু অ্যাস্টারোজাইন পত্রহীন, কিন্তু পাতার মত আঁশে গা ঢাকা; ফার্ন-সদৃশ গাছ অনেক ঊর্ধ্বে মাথা তুলেছে, যেমন আর্কিওটেরিস ১৫ মিটার পর্যন্ত। কয়েক নিযুত বছরে তরু জগৎ বনের উর্বর ক্ষেত্রে সুপ্রচুর উদ্ভিজ্জ খাদ্য সাজিয়ে যেন প্রাণী কুলকে স্বাগত জানাতে তৈরি হয়ে গেল।

সম্ভবত প্রথম স্থলে চড়েছে মাকড়সা, কাঁকড়াবিছে ইত্যাদি প্রাণী যারা বৈজ্ঞানিক ভাগাভাগি অনুসারে ঠিক কীট নয়। সরু নলের মধ্য দিয়ে নিঃশ্বাস নিয়েছে এরা এবং কখনও খুব বড় হতে পারল না কারণ দেহের আয়তন বাড়লে এই পদ্ধতি কাজ করে না। যারা তা পেরেছে সেই মেরুদণ্ডধারীদের পথপ্রদর্শক প্রথম স্থলে চড়ল উদ্ভিদের বেশ কয়েক কোটি বছর পরে ডিভোনিয়ানের শেষে, প্রাণীটি মাছ—কিন্তু সামান্য পরিবর্তিত। এই কল্পে মাছ বংশে নানা দিকে এত বিচিত্র অভিব্যক্তি হয়েছে যে তা মৎস্য যুগের সূচনা করেছে বলা হয়। প্রথম দিকে দেখা দিল বড় বড় হাঙর, স্টিং রে ইত্যাদি যাদের হাড় অপেক্ষাকৃত নরম, কিন্তু কঠিন অস্থিযুক্তরাই বহু শাখা প্রশাখায় বিকশিত হয়ে রাজত্ব করেছে সাগরে, আজও তাই দেখা যায় সর্বত্র।

এখন লুপ্ত, তাদের বোকা বানিয়ে হঠাৎ কয়েক বছর আগে আফ্রিকার অদূরে জেলেদের জালে ধরা পড়ল রক্ত মাংসের প্রাণীটি।

পরবর্তী পার্মিয়ান কল্প ও সেই সঙ্গে পুরাজীবীয় অধিকল্পের সমাপ্তির আগেই সরীসৃপরা উভচরদের উপর প্রাধান্য পেয়েছে। তাদের ছোট বড় নানা আকার, কেউ উদ্ভিদভুক্, কেউ আবার এই নিরামিষাশীদের মাংস খেয়ে বাঁচে। ক্রমে বিচিত্র রূপে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ঘর বানিয়ে তারা প্রাণী জগতে তাদের সাফল্যের সাক্ষ্য রেখে গিয়েছে। ১৯৬৯-৭১ সালে দক্ষিণ মেরুর প্রায় ৬৫০ কিলোমিটার দূরে দুই জাতের সরীসৃপের ফসিল আবিষ্কার হয়েছে, আবার তারা যে বর্তমান দক্ষিণ আফ্রিকা দেশেও বাস করত তা নির্দেশ করে যে পুরাজীবীয়ের শেষেও দক্ষিণ আফ্রিকা ও আন্টার্কটিকার মত দুটি দূর অঞ্চল আদিম অখণ্ড মহাদেশটির অংশ ছিল।

মধ্যজীবীয় অধিযুগের সূচনায় এরা এক রহস্য সৃষ্টি করে গিয়েছে যা নিয়ে পণ্ডিতরা আজও মাথা ঘামাচ্ছেন। এই প্রথম সরীসৃপদের দাঁত, চোয়াল ইত্যাদির ফসিলে ভবিষ্যৎ স্তন্যপায়ীদের আভাস পাওয়া যায়, তা ছাড়া অন্যান্য সাদৃশ্যও সন্দেহ করা হয়। পরবর্তী সরীসৃপরা তাদের তুলনায় দৈহিক গঠনে স্তন্যপায়ীদের থেকে আরও দূরে, কিন্তু প্রথম আগন্তুকরা অভিব্যক্তির পথে বেশী অগ্রসর হয়েছে মনে হলেও তারাই প্রতিযোগিতায় হেরে নিপাত গিয়েছে। এই হেঁয়ালির সমাধানে কেউ কেউ বলেছেন যে আধুনিক স্তন্যপায়ীদের মত শরীর গরম রাখবার জন্য তাদের গায়ে লোম বা চামড়ার নিচে চর্বির স্তর ছিল, পার্মিয়ানের শেষ দিকে যখন বেশ ঠাণ্ডা পড়েছিল তখন এই ব্যবস্থা কাজে লেগেছে, কিন্তু মধ্যজীবীয়ের প্রথম কল্প ট্রায়াসিকে আবার জলবায়ু উষ্ণ হয়ে উঠলে দরকার পড়ল স্তন্যপায়ীদের দ্বিতীয় ও বিপরীত ব্যবস্থা—গরমে বা পরিশ্রমের পর শরীর ঠাণ্ডা করবার। তা হয়তো এই আদি সরীসৃপদের ছিল না, তাই তারা লোম বা চর্বির বর্মের নিচে সিদ্ধ হয়ে মরেছে।

দ্বিতীয় দলীয় যে সব সরীসৃপ টিকে গেল থেসোডন্ট গোষ্ঠী তাদের অন্যতম। গায়ে চর্বি বা লোম না থাকায় ট্রায়াসিকে তারা সহজে দেহ-তাপ ত্যাগ করেছে, তা ছাড়া তাদের পা স্তন্যপায়ী-সদৃশদের চেয়ে সোজা বলে উঁচু হয়ে দ্রুত চলত তারা, পূর্বতনদের মত গুড়ি মেরে এঁকেবেঁকে নয়। উষ্ণ জগতে প্রতিযোগিতায় হেরে স্তন্যপায়ী-সদৃশরা ছোট হতে হতে ট্রায়াসিকের শেষে ইঁদুরের মত ক্ষুদ্রাকার হয়ে পড়ল। অতঃপর যবনিকা—আদি জুরাসিক অধিকল্পের পর তাদের একটি ফসিলও পাওয়া যায় নি। কিন্তু গুরুতর কথাটি এই যে পুরাজীববিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক মতে নিজেরা মরেও তারা জন্ম দিয়েছে

স্তন্যপায়ী শ্রেণীর, বহু কোটি বছর-ব্যাপী পৃথিবীর অধিপতি বিশাল সরীসৃপদের পরেও যারা টিকে আজ প্রাণী জগতে নিঃসন্দেহে প্রধান এবং মানুষের জন্মদাতা। অন্য দিকে থেসোডন্টরা মধ্যজীবীয় অধিকল্পকে সরীসৃপ যুগে পরিণত করেছে জলে স্থলে আকাশে বিচিত্র বংশধর সৃষ্টি করে। তাদের মধ্যে কুমির আজও বর্তমান, কিন্তু লুপ্ত সবচেয়ে আজব উত্তরাধিকারী ডাইনোসর দল যাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম স্থলচর প্রাণীরা।

ডাইনোসর কুল সম্বন্ধে আমাদের বিস্ময় ও কৌতূহলের অন্ত নেই (তার সঙ্গে আছে কিছু ভুল ধারণা), কিন্তু সেই কাহিনীর আগে তাদের জ্ঞাতি আকাশচর ও জলচর সরীসৃপদের সঙ্গে পরিচয় করা যেতে পারে, তাদের দলেও আছে অনেক আশ্চর্য, প্রায় অবিশ্বাস্য প্রাণী। ১৩ কোটি বছর প্রাচীন টেরান্ডন পৃথিবীর ইতিহাসে আকাশের বৃহত্তম প্রাণী বলে প্রসিদ্ধ, পাখা মেললে তার বিস্তার সওয়া আট মিটার পর্যন্ত। পাখায় অবশ্য পালক ছিল না, হাত দুটির সঙ্গে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত বাদুড়ের মত চামড়া জোড়া, হাত পায়ে তিনটি করে ধারালো নখযুক্ত আঙুল। লম্বা দন্তহীন ঠোঁট, উলটো দিকে লম্বা ঝুঁটি, সব নিয়ে মূর্তিটি মোটেই সুশ্রী নয়। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস যে যদিও বা ওড়ার আরম্ভে সাহায্য করতে সে প্রকাণ্ড ডানা অল্প নাড়তে পেরে থাকে, তার পর স্থির পাখায় ভর করে ভেসেছে সে (যেমন চিল প্রায়ই ভাসে) এবং ফসিলের নজির বলে যে মাঝে মাঝে হুড়মুড়িয়ে অধঃপতন হয়েছে জলে। তবু টেরানডন কি করে তিন কোটি বছর টিকল তা এক হেঁয়ালি। হয়তো মহাকাশে বিচরণের সহায়ক কোনও সংগতি ছিল তাদের, তার চিহ্ন ফসিলে নেই, যেমন লোম, যা সরীসৃপ দেহে থাকে না। তার আত্মীয় সরীসৃপদের ফসিলে ত্বকের সঙ্গে আঁশের মত বস্তুর আভাস মেলে, এবং ১৯৬৬ সালে রাশিয়ার কাজাখস্টানে প্রাপ্ত একটি ফসিলে ঘন লোমের আবরণ লক্ষিত হয়েছে, বিশেষত বুকের কাছাকাছি। পাখি বা স্তন্যপায়ী আকাশচর বাদুড়ের দেহে যেমন তাপ নিয়ন্ত্রণের সংগতি আছে, টেরানডনরাও ক্রমবিকাশের পথে তার তুল্য ব্যবস্থার দিকে কিছুটা এগিয়ে থাকতে পারে।

আর এক দল নভশ্চর ছিল ২০ থেকে সাড়ে ছ কোটি বছর আগে, নাম টেরোসর, মুখভরা দাঁত, চামড়ার ডানা বাদুড়েরই মত। ছোট জাতের প্রাণীরা জলের ধারে গাছের ডালে বসে থাকত মাছরাঙা যেমন করে, সময় মত হয়তো বার কয়েক পাখা নেড়ে হাওয়ায় ভর করে মাছ তুলে নিত মুখে, তার পর ঊর্ধ্বগামী বাতাসের স্রোতে ভেসে এসে বসত কোনও ঝোপ বা ছোট গাছে, পরে বেয়ে বেয়ে উঠত আরও উঁচু ডালে

যেখান থেকে আবার শিকারে ঝাঁপ দেওয়া চলে। এদেরই দলে ১৫ কোটি বছর আগে ছিল ছোট বড় টেরোডাক্টিল, লম্বা চামচের মত দাঁতালো ঠোঁট, পক্ষবিস্তার কারও ১০ সেন্টিমিটারেরও কম, কারও সাড়ে সাত মিটার পর্যন্ত জানা ছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের টেকসাস অঞ্চলে এক তরুণ ছাত্র গবেষক তিনটি ফসিল উদ্ধার করেন, তাঁর হিসাবে প্রথম টেরোডাকটিলটির দুই পাখার ডগা থেকে ডগা পর্যন্ত মাপ ছিল ১৫½ মিটার, অর্থাৎ টেরানডনের প্রায় দ্বিগুণ (এর সঙ্গে তুলনীয় বর্তমান পাখিদের দীর্ঘতম পক্ষ-বিস্তার—মাত্র সাড়ে তিন মিটারের কাছাকাছি, তা দেখা যায় সামুদ্রিক পাখি অ্যাল্‌বাট্রসের এক জাতে)। তাই আবিষ্কর্তা ডগ্‌লাস ল'সন বলেন এই দানবটি এক নতুন প্রজাতি। নিজের গবেষণার থেকে তিনি আরও এক দাবি জানিয়েছেন, চলতি ধারণা অনুসারে টেরোডাকটিলরা থাকত সমুদ্রের ধারে, সেখানে মাছ ধরে খেত এবং সমতল ভূমির থেকে আকাশে উড়বার মত তাদের পাখার জোর ছিল না, তাই পায়ে পায়ে পাহাড়ে চড়ে সেখান থেকে হাওয়ায় ভেসে পড়ত। কিন্তু টেকসাসের তিনটি ফসিলই পাওয়া গিয়েছে এমন জমিতে যার অন্তত ৩০-৫০ কিলোমিটারের মধ্যে সে যুগে কোনও পাহাড় ছিল না এবং সেই জমির স্তরও সমুদ্র-জাত নয়। তাই ল'সন বলেন তাঁর আবিষ্কৃত এই ভারী প্রাণীরা মাটিতেই বাস করত এবং সেখান থেকেই উড়ত, আর তা হলে লঘুভার টেরোডাক-টিলরা সেই কাজটি পেরেছে আরও অনায়াসে। তাঁর আর একটি অনুমান যে তাদের খাদ্য ছিল মাছ নয়, মাংস, মরা ডাইনোসরদের দেহে লম্বা গলা ঢুকিয়ে শকুনির মত পেট ভরাত তারা।

টেরানডন, টেরোসরের মত আকাশচররা ছাড়া মৎস্য জগতের দুটি পরম শত্রু ছিল সামুদ্রিক সরীসৃপ ক্রনসরাস, প্রায় ১৩ মিটার দেহে পৌনে তিন মিটার লম্বা খুলি তার, এবং টাইলোসরাস, লম্বায় ন মিটার, প্রকাণ্ড মুখ ভরে সারি সারি সরু ধারালো দাঁত ; দেহের আকার অনেকটা মাছের অনুরূপ, বৈঠার মত চারটি পা, সে কালের প্রকাণ্ড টার্পন মাছের (২২৫-২৭৫ কিলোগ্রাম) মত প্রাণীকেও অনায়াসে ঘায়েল করে খেত এই দানবরা। মাপে এদেরও হার মানিয়েছে ইলামোসরাস, দেহের আকৃতি কচ্ছপের মত, যদিও কঠিন আবরণ নেই, তার সঙ্গে যুক্ত জিরাফের চেয়েও লম্বা গলা, পূর্ণবর্ধিত প্রাণীটি ১৫ মিটারেরও বেশী বেড়েছে, তার প্রায় অর্ধেকটা ঘাড়। আর ছিল ইক্‌থিওসরাস অর্থাৎ মেছো সরীসৃপ, বর্তমান সোর্ডফিশের মত দেখতে বলে ঐ নাম। লম্বায় সাধারণত তিন থেকে সাড়ে চার মিটার, তবে ১২ মিটার ও দীর্ঘতর প্রাণীর ফসিল পাওয়া গিয়েছে। একটি ফসিলে যে ইক্‌থিওসরাসকে সরীসৃপীয় নিয়মের বিরুদ্ধে ডিমের বদলে বাচ্চা প্রসব করতে দেখা যায়

তা আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে লক্ষ্য করেছি। প্রকৃত কচ্ছপ প্রায় সাড়ে তিন মিটার পর্যন্ত বড় হয়েছে সরীসৃপ যুগে।

এখানে বিজ্ঞান ছেড়ে কল্পিত বিজ্ঞানের জগতে একটু ঘুরে আসা যেতে পারে। কাহিনীর সূচনা ষষ্ঠ শতাব্দে যখন স্কটল্যানডে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন এক সন্ন্যাসী। নেস্ হ্রদের ধারে নাকি হঠাৎ এক প্রকাণ্ড জন্তু জল থেকে উঠে এসে তাঁর এক শিষ্যকে তাড়া করল, কিন্তু গুরুর মন্ত্র বলে দানবকে হটে যেতে হল। তার পর থেকে স্থানীয় লোকদের মধ্যে নানা প্রবাদ রটেছে, যেমন তাকে ডাঙায় উঠে রোদ পোহাতে, রাস্তা পার হতে দেখা গিয়েছে। আজ পর্যন্ত এই অদৃশ্য হ্রদবাসীকে নিয়ে জল্পনার অন্ত নেই—তার আদুরে নাম হয়েছে নেসি। ১৯৩৪ সালে তোলা এক প্রসিদ্ধ ছবিতে দেখা যায় যেন লম্বা ঘাড়ের শেষে ছোট একটি মাথা জল থেকে উঠেছে। যেমন হিমালয়ের প্রাবাদিক 'বিলুপ্ত বনমানুষ' ইয়েতির রহস্য উদঘাটন করতে অনেক বৈজ্ঞানিক অভিযান গিয়েছে, তেমনি আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে নেসিকে চিনতে প্রায়ই চেষ্টা হয়। সম্প্রতি জলের নিচে শব্দ তরঙ্গ প্রতিফলিত করে সোনার (sonar) যন্ত্রে তার মূর্তি গড়ে তুলতে চেয়েছেন অনেকে। ১৯৬০ দশকের শেষ দিকে বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এ ভাবে দ্রুতকম্প ধ্বনি তরঙ্গের প্রতিধ্বনি থেকে যন্ত্রের পর্দায় বৃহৎ চলন্ত কিছুর স্পষ্ট নির্দেশ পেয়েছিলেন যা কয়েক মিটার লম্বা, ঘণ্টায় ২৭ কিলোমিটার বেগে চলতে পারে, মিনিটে ১৪০ মিটার দ্রুত ডুব দিতে পারে। মাছ এত দ্রুত উঠতে নামতে পারে না। এক মার্কিন অভিযানের সংগৃহীত এই রকম ধ্বনি-প্রতিফলিত ছবি পরীক্ষা করে যুক্তরাষ্ট্রের এক বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞরা ১৯৭২ সালে একটি নয় দুটি নেসির নজির পেয়েছেন, তারা অন্তত ছয় থেকে নয় মিটার লম্বা, দেহে আছে কয়েকটি কুঁজ, পাখনা ও লম্বা লেজ। নেসির পরিচয় সম্বন্ধে সবচেয়ে প্রচলিত ও রোমাঞ্চক অভিমত হল যে প্রাচীন কালের কোনও বিশাল বিলুপ্ত সরীসৃপ এখনও এই হ্রদে টিকে আছে। অবিশ্বাসীরা বলেন এত কাল ধরে এই দানবদের জীবন ধারণের মত যথেষ্ট খাদ্য সেখানে নেই, তা ছাড়া বংশ রক্ষা করতে হলে অন্তত কুড়িটি জন্তু দরকার, যা কল্পনাও করা যায় না। পরিবর্তে জল্পনা হয়েছে যে ক্যামেরায় বা যন্ত্রে যা ধরা পড়ছে তা আসলে জলজ উদ্ভিদ বা অন্য বস্তু বা বর্তমান জগতেরই কোনও প্রাণী। সবচেয়ে সাম্প্রতিক ব্যাখ্যা প্রস্তাবিত হয় ১৯৭৯ সালে—নেসি আমাদের পরিচিত হাতি ছাড়া কিছু নয়, যখন জলের উপর শুঁড় তুলে নিঃশ্বাস নেয় তখন তা দেখায় যেন বহু কোটি বছর প্রাচীন কোনও সরীসৃপের গলা। কিন্তু ইয়েতির মত নেসি এখনও রহস্যাবৃত।

সরীসৃপ কুলে যা নিঃসংশয়ে সত্য তার বিস্ময়ও কম নয়, রোমাঞ্চের খোঁজে আমাদের সুদূর স্কটল্যানডে যাওয়ার দরকার নেই, মাত্র ১৫ কোটি বছর পিছিয়ে ডাইনোসর পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেই হয়। বাস্তব যে অনেক সময়ে কল্পনাকেও হার মানায় তারা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, তাদের সম্বন্ধে তাই আজও অন্তহীন কৌতূহল।

ডাইনোসর নামটি শুনলে আমাদের ডাইনী মনে পড়তে পারে, আসলে শব্দটির অর্থ 'ভয়ংকর সরীসৃপ', এবং সত্যি তাদের এক এক জনের চেহারা বা আকৃতি অতি বড় দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করা সহজ নয়, বিদেশী রূপকথার ড্র্যাগন তাদের কল্পরূপ।

মধ্যজীবীয় অধিকল্প বা সরীসৃপ যুগের মধ্যে দীর্ঘ ১৩½ কোটি বছর ধরে ডাইনোসররা ছিল এই গ্রহের অবিসংবাদিত সম্রাট। পৃথিবীর সব প্রধান মহাদেশে বিচরণ করেছে তারা, ফসিলের সাক্ষ্য আছে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, অসট্রেলিয়া ও য়োরোপে, এশিয়ায় মংগোলিয়া, চীন ও ভারতে। এ দেশের এক সাম্প্রতিক আবিষ্কার মহারাষ্ট্রে ১৯৫৮ সালে, কয়েক বছর আগে এমনি এক কঙ্কালের অবশিষ্ট জুড়ে সাজিয়ে দেখানো হয়েছিল বরানগরে এক প্রদর্শনীতে। প্রাচীন কালে এই সব ফসিল প্রাবাদিক দৈত্য দানবের হাড়গোড় বলে ভাবা হয়েছে, শুধু জন কয়েক গ্রীসীয় দার্শনিক তাদের তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিলেন। বেশ কিছু ফসিল আবিষ্কারের পর ইংল্যানডে রিচার্ড ওএন এই বৃহৎ প্রাণীদের জন্য ডাইনোসরিয়া নামটি সৃষ্টি করেন। তাঁর উৎসাহে এই দলীয় সরীসৃপ ইগুআনডনের প্রকৃত মাপ অনুযায়ী এক মূর্তি তৈরি হয় যার শূন্য গর্ভে এক সান্ধ্য ভোজের অনুষ্ঠান হয়েছিল ১৮৫৩ সালের শেষ দিনটিতে।

ডাইনোসর বংশের সূত্র অনুসন্ধানে বিজ্ঞানীরা ২৩ কোটি বছর আগে থেসোডন্ট সরীসৃপ গোষ্ঠী পর্যন্ত পৌঁছেছেন। হাজার হাজার বছরের ক্রমবিবর্তনে তাদের পা ক্রমশ এত লম্বা ও জোরালো হল যে দৌড়ে তারা অন্য সব প্রাণীকে হার মানাত, তখন তাদের থেকে দেখা দিল সরীসৃপ কুলের বিভিন্ন শাখা, যেমন আকাশচর, কুমিররূপী এবং ডাইনোসর কুল। আনুমানিক ২৫০ রকম ডাইনোসর এখন জানা আছে, নতুন জাতও মাঝে মাঝে আবিষ্কার হচ্ছে। তাদের দুই বর্গ, এক দলে নিতম্বের অস্থি পাখির তুল্য, অনেকটা চৌকোণ, অন্য বর্গে তা সরীসৃপদের মত, মোটামুটি ত্রিকোণ। এদের মধ্যে প্রচুর বৈচিত্র্য—কেউ নিরামিষভোজী কেউ মাংসাশী, কেউ চার পায়ে চলে কেউ প্রধানত দু পায়ে, কেউ বা স্থল ছেড়ে জলেও হাঁটা চলা করে, কারও পা পাখির তুল্য কারও পশুর কারও বা সরীসৃপের ; শেষের দিকে অনেকে দেখা দিয়েছে মাথায় ও দেহে হাড়ের বর্ম নিয়ে। এই সব

বৈশিষ্ট্য অনুসারে ডাইনোসররা ছয় উপবর্গে বিভক্ত।

চেহারায় আরও বৈচিত্র্য দেখা যায়, কেউ বা এত উদ্ভট যে মনে হয় বকচ্ছপ জাতীয় পাগলামি, কিন্তু অতি বাস্তব সত্য তারা। কারও মুখটি যেন হাঁসের ঠোঁট এবং আঙুল তাদেরই মত চামড়া দিয়ে জোড়া ; কারও কারও মাথায় শিং, কারও বা লেজে ; প্রোটোসেরাটপ্‌স ও ট্রাইসেরাটপ্‌সের ঘাড় ঘিরে উঠেছে অর্ধচক্রাকার একটি হাড়ের বেড়া, দ্বিতীয়টির মাথার উপর মোষের মত দুটি তীক্ষ্ণ শিং, স্টাইরাকোসরাসের সেখানে ছ'টি, দুইয়েরই আরও সামনে গণ্ডারের মত অপেক্ষাকৃত ছোট শিং একটি করে, এদের সকলেরই মুখের ডগা টিয়ার ঠোঁটের মত ; ছয় মিটার লম্বা ও প্রায় সাড়ে তিন মিটার উঁচু উদ্ভিদভুক্ স্টেগোসরাসের পিঠে দুই সারি হাড়ের 'পাখনা' ছিল লেজের গোড়া পর্যন্ত, তার ডগায় চার জোড়া প্রখর শিং বা শলা। লেজের ঝাপটায় তা বিশাল মাংসাশী আক্রামকদের মোটা কঠিন চামড়াও ফুটো করত (চিত্র ১০খ)। এই সব লেজ, বর্ম, শিং সাধারণত নিরামিষাশীদের আত্মরক্ষার কাজে লেগেছে, কিছু হয়তো অলংকার মাত্র। শিকারী ডাইনোসরদের প্রধান অস্ত্র ছিল তীক্ষ্ণ দাঁত ও নখ।

দুই বর্গের ডাইনোসররাই বড় মাঝারি ছোট নানা মাপে তৈরি হয়েছে। সবাই ভয়ংকর ছিল না, অনেকের স্বভাব নিরীহ। কেউ বা প্রায় একটা মোরগের মত ছোট, কম্প্‌সগ্‌নেথাস মাত্র মিটার খানেক লম্বা, দ্রুত ছুটে সে যেমন নিজের শিকার ধরত, আবার গুরুভার শিকারীদের থেকে পালাতে পেরেছে। কিন্তু ডাইনোসর বংশেই জন্মেছে চার তলা বাড়ির সমান উঁচু পৃথিবীর বৃহত্তম স্থলচর প্রাণীরা এবং ভয়াল নখ দন্ত সম্বলিত করালমূর্তি হিংস্র শিকারী দল। বৃহৎ ডাইনোসররা চরম প্রতিপত্তি লাভ করেছে জুরাসিক কল্পে, তাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে অতিকায় তারা দেখা দিয়েছে নিরামিষভোজীদের দলে।
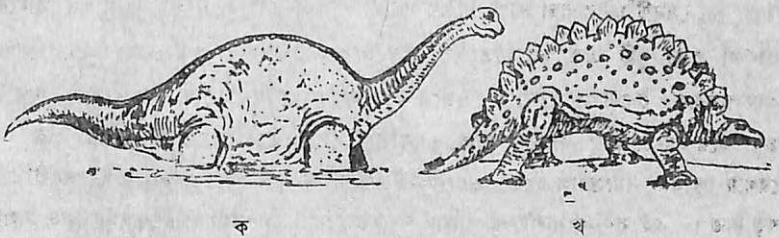
চিত্র ১০। দুটি উদ্ভিদভুক্ ডাইনোসর। ক—ব্র্যাকিওসরাস, ওজনে এ যাবৎ পৃথিবীর বৃহত্তম স্থলচর প্রাণী। খ—স্টেগোসরাস, পিঠে দুই সারি পাখনা।

অবশ্য দেহ বস্তুর ভেদাভেদের ফলে প্রাণীটি লম্বায় যত বড় সেই অনুসারে ওজনে ভারী নাও হতে পারে। গুরুভারদের মধ্যে শীর্ষ স্থান অধিকার করে ব্র্যাকিওসরাস (চিত্র ১০ক), ওজন ৫৫ টন, অর্থাৎ প্রায় হাজার মানুষের সমান, তিমি ছাড়া এত ভারী প্রাণী পৃথিবীতে আর জন্মায় নি ; তার নাক থেকে লেজের শেষ পর্যন্ত ২৫ মিটার, লম্বা গলা পৌঁছাত ১২-১৩ মিটার উ'চু গাছের মগডালে। দৈর্ঘ্যে স্থলচর প্রাণীদের মধ্যে আর সকলকে হার মানিয়েছে ১৫ কোটি বছর প্রাচীন ডিপ্লডকাস, ২৭-৩০ মিটার পর্যন্ত লম্বা সে ; তার কাছাকাছি যায় ব্রন্টসরাস, ২৭ মিটার লম্বা, ৩৫ টন ভারী, এবং আপাটোসরাস, ২৭ মিটার, ৪৫ টন। ঘুমের সময়টা ছাড়া এদের প্রায় সারা দিনই কাটত পাতা, কচি ডাল, নরম ছাল চিবিয়ে উদর পূরণ করতে, কারণ নিরামিষ খাদ্যে পুষ্টি কম, তা ছাড়া খাদকের কলেবর প্রকাণ্ড। চার হাতির সমান ভারী কামারাসরাসের দৈনিক প্রায় পৌনে এক টন ডাল পাতা দরকার হয়েছে। এদের সকলেরই থামের মত চারটি পা, পিছনের দুটি কিছু বড়। এই সব লম্বগ্রীবদের উ'চু ডালের পাতা খেতে খুব সুবিধা, বিশেষত সামনের পা কিছুটা তুলে, কিন্তু গ্রীবার প্রান্তে মাথাটি ছিল বিশাল বপুর তুলনায় অতি ক্ষুদ্র—ব্র্যাকিওসরাসের মগজ মাত্র একটি আতা ফলের সমান। অনেকের ধারণা বপুর চাপে এই সব দানবদের প্রায় হাড় গু'ড়িয়ে যাওয়ার মত অবস্থা দাঁড়িয়েছিল, তাই তারা অগভীর জলে অধিকাংশ সময় কাটিয়ে ভার লাঘব করত।

মাংসাশীরা এদের চেয়ে ওজনে আয়তনে খাটো হলেও শক্তি ও দাপটে অনেক ভয়ংকর। এই দলে বৃহত্তম ও ভীষণতম ছিল টিরানোটরাস, ১৫ মিটার নাগাদ লম্বা, প্রায় ১০ টন ভারী দেহ, দু পায়ে চলত সে দোতলা বাড়ির সমান মাথা তুলে। দেড় মিটার মাপের এই মাথার প্রায় সবটাই মুখ, হাঁ করলে সওয়া এক মিটার খুলে যায়, এ কালের অধিকাংশ জন্তু অনায়াসে গিলতে পারত সে, যদিও চোয়াল জুড়ে সাজানো ছিল ১৫ সেনটিমিটার লম্বা তীক্ষ্ণ দাঁতের সারি। অথচ এই রুদ্রমূর্তি সরীসৃপের সামনের পা বা হাত দুটি এত সংকুচিত যে প্রায় অকেজো, তথাপি প্রায় এক মিটার লম্বা। অ্যালোসরাস, দৈর্ঘ্যে ১৫ মিটার, ওজনে আট টন, পিছনের পায়ের মোটা মোটা আঙুলে ভর করে হাঁটত, ছুটত সামনে ঝু'কে, তখন ভারী লেজ উঠে আসত মেরুদণ্ডের সঙ্গে এক রেখায় ভূমির সমান্তরাল হয়ে ; ৬০ সেনটিমিটার লম্বা মুণ্ড, মুখভরা প্রায় আট সেনটিমিটার বড় দাঁত। এই সব মাংসাশীদের পাল্লায় পড়ে অতিকায় নিরামিষাশীরা তাদের লেজ চালাত চাবুকের মত।

উদ্ভিদভুক্ বৃকোদরদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে মধ্যজীবীয় জগতে গাছপালার অভাব

চিত্র ১১। অতিকায় মাংসাশী ডাইনোসর টিরানোসরাস।

ছিল না। সুতরাং তাদের খেয়ে যারা বেঁচেছে তারাও পেয়েছে যথেষ্ট খাদ্য। খাবারের খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে শিকারী ডাইনোসররা একে অন্যের বাচ্চা বা ডিম গিলে ফেলত।

লড়াইও লেগেছে প্রায়ই, শুধু যে মাংসভুকরা পত্রভুক্‌দের আক্রমণ করেছে তাই না, নিহত শিকার নিয়ে নিজেদের মধ্যেও যুদ্ধ লেগেছে। একই প্রজাতির মর্দারা মনোহারিণী স্ত্রীর দখল নিয়ে লড়েছে, বিচরণ ক্ষেত্র নিয়েও নিরামিষ বা আমিষ খাদকরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে থাকতে পারে। টিরানোসরাস বা অ্যালোসরাস যখন প্রকাণ্ড হাঁ করে বর্ম পরিবৃত তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ সম্বলিত কোনও ডাইনোসরের দিকে তেড়ে এসে শিঙের গুঁতো খেত অথবা ডিপ্লডকাসের দল পালিয়ে জলে আশ্রয় নিতে নিতে তাদের একটির ঘাড় কামড়ে ধরে লেজের বাড়ি খেয়ে রেগে যেত, তখন পর্বতপ্রমাণ দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর ধস্তাধস্তিতে মেদিনী কেঁপে উঠেছে নিশ্চয়। এই সব লড়াই নিঃশব্দে ঘটে থাকতে পারে, কারণ বড় ডাইনোসরদের ডাক বা গর্জন ছিল কিনা সন্দেহ, আধুনিক সরীসৃপ কুলে এক শুধু কুমিরের কণ্ঠস্বর লক্ষণযোগ্য। ১৯৭১ সালে মংগোলিয়া ও পোল্যান্ডের এক বৈজ্ঞানিক দল গোবি মরুভূমিতে ডাইনোসর সংঘর্ষের প্রত্যক্ষ নজির প্রথম আবিষ্কার করে, যদিও যোদ্ধারা আকারে মাত্র মিটার দুয়েক। চুনাপাথরের গায়ে প্রাপ্ত অস্থির সন্নিবেশ থেকে বোঝা যায় ১০ কোটি বছর আগে এক উদ্ভিদভুকের মাংসের লোভে শত্রু তার মাথাটি চেপে ধরেছিল সামনের দুই পায়ে, তার পর খাদ্য খাদক দুইই হঠাৎ মারা পড়ে—কেন তা কেউ জানে না।

গবেষক ও তাত্ত্বিকরা ডাইনোসরদের সম্বন্ধে বহু দিনের চলতি ধারণাগুলি সম্প্রতি নতুন করে পরীক্ষা করছেন, যেমন অন্যান্য সরীসৃপদের মত তাদেরও রক্ত শীতল এবং চলা ফেরা আড়ষ্ট ছিল, যেমন অতিকায়রা তাদের দেহ ভার সামলাতে জলে অর্ধনিমগ্ন হয়ে অধিকাংশ সময় কাটাত এবং মগজ ক্ষুদ্র বলে ডাইনোসররা ছিল নির্বোধ। রক্ত-তাপ প্রসঙ্গে তিন মার্কিন বিজ্ঞানী স্টেগোসরাসের পিঠজোড়া হাড়ের পাখনাগুলির এক অভিনব ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রাক্তন ধারণা অনুসারে সেগুলি হয় দেহালংকার নয়তো আত্মরক্ষার ব্যবস্থা, খাড়া করে তুললে শত্রু ভয় পেত অথবা পিঠে কামড় বসাতে পারত না, নামিয়ে নিলে দেহের পাশটা রক্ষা পেত। কিন্তু এই বিজ্ঞানীরা পাখনাগুলির সাজ ও গঠন পরীক্ষা করে ১৯৭৬ সালে বলেন যে গরমের সময়ে এদের ফাঁক দিয়ে চালিত বাতাস শরীর ঠাণ্ডা করত। তা ছাড়া পাখনার অন্তর্ভুক্ত হাড়ের কাঠামো এবং রঞ্জন রশ্মি দ্বারা পরীক্ষার থেকে মনে হয় এই হাড়ের মধ্যে রক্ত প্রবাহের নালী ছিল, সুতরাং হয়তো দেহ-তাপ ঠিক মাত্রায় রাখতে যতটা দরকার, শরীরে সেই পরিমাণ রক্ত চলাচল সম্ভব হত। এই গবেষকদের মতে এই নিয়ন্ত্রণ প্রায় উত্তরকালীন স্তন্যপায়ীদের মতই কার্যকর ছিল।

এদের এক বছর আগে ২৮ বছর বয়স্ক পুরাজীববিজ্ঞানী এড্রিয়ান ডেজ্‌মন্ড এক বই প্রকাশ করে একই ধারণার সমর্থনে আরও যুক্তি দেখান। তাঁর হিসাবে তাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকলে বড় জাতের ডাইনোসরের পক্ষে সক্রিয় থাকতে হলে দেহ যতটা উষ্ণ রাখা দরকার তার চেয়ে মাত্র এক ডিগ্রি কমে গেলে তাকে বেশ কয়েক ঘণ্টা রোদে গা গরম করতে হত—তাদের ওজন মনে রাখলে সেটা আশ্চর্য নয়। কিন্তু এই কাজে এতটা সময় চলে গেলে ব্র্যাকিওসরাস বা ব্রন্টসরাস তো প্রায় অকর্মণ্য হয়ে পড়বে। উষ্ণ-শোণিত না হলে প্রকাণ্ড টিরানোসরাস এবং গণ্ডারোপম ট্রাইসেরাটপ্‌সে প্রচলিত ধারণা অনুসারে তুমুল যুদ্ধে মাটি কাঁপাত কি করে! এক বিশেষজ্ঞের মতে ১০ মিটার দীর্ঘ এই দ্বিতীয় প্রাণীটির পায়ের পেশী এত জোড়ালো ছিল যে সে ঘণ্টায় ৪৮ কিলোমিটার বেগে দৌড়েছে। যে ক্ষিপ্রগতি জন্তুটির ডাক নাম উটপাখি-ডাইনোসর সে নাকি ঘণ্টায় ৮০ কিলোমিটার বেগে পর্যন্ত ছুটতে পারত, শারীরিক ব্যবস্থা আধুনিক সরীসৃপদের মত হলে এতটা তৎপরতা সম্ভব না—হতে হয় গিরগিটি বা গোসাপের মত আড়ষ্ট, অনড়।

দ্বিতীয়ত ছোট সরীসৃপরা রোদ থেকে ছায়ায় এবং ছায়া থেকে রোদে দরকার মত সরে গিয়ে দেহ-তাপ ঠিক রাখে, কিন্তু ডিপ্লডকাস জাতীয়দের কলেবর আশ্রয় পাবে এমন ছায়া-নীড় নিশ্চয় অনেকটা বিরল ছিল মেঠো সাপ বা বহুরূপীর তুলনায়। সুতরাং এই তরুণ বিজ্ঞানীর মতে ডাইনোসর দেহে তাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ছিল; তা ছাড়া তাঁর বিশ্বাস পরবর্তী কোনও কোনও জন্তুর চেয়ে তাদের বুদ্ধিও বেশী ছিল। অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের অনেকে মনে করেন ডাইনোসররা কোনও উপায়ে দেহ-তাপ অনেকটা স্থির রাখতে পারত, বর্তমান সরীসৃপদের মত তা বাইরের তাপের সমান বাড়ত কমত না, ফলে তারা শ্লথগতি ও আড়ষ্ট ছিল না। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রবার্ট ব্যাকার ডাইনোসর ও পরবর্তী উষ্ণ-শোণিত প্রাণীদের পা ও দেহের গঠন তুলনা করে সন্দেহ করেন যে স্তন্যপায়ী ও পাখিদের হৃদ্‌যন্ত্রের যে উন্নত গঠনের ফলে তারা অনেক সক্রিয় ও অনাড়ষ্ট ডাইনোসরদেরও তা ছিল, যদিও অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা এই দাবি মানেন না।

ডাইনোসর ও উন্নত স্তন্যপায়ীদের পায়ের গঠনে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে ব্যাকার বলেন হাতি যেমন ভারী জন্তু হয়েও স্বাভাবিক স্থলচর তেমনি সরীসৃপ-নিতম্বাস্থি বর্গের অতিকায় নিরামিষাশীরা তাদের স্তম্ভাকার পা সত্ত্বেও সহজেই স্থলে চলতে পারত, যদিও জলেও নামত তারা। এই ধারণার কিছুটা সমর্থন মিলেছে টেকসাস প্রদেশে, সেখানে ১০ কোটি বছর আগে একদা এক উদ্ভিদভুক্ ডাইনোসরকে অল্প জলের উপর দিয়ে তাড়া করেছিল

ক্ষুদ্রতর পক্ষীপদ কোনও মাংসাশী, কাদা ক্রমে পাথর হয়ে পলাতকের পদচিহ্ন সংরক্ষণ করেছে (এক একটি খোবলে প্রায় ৭০ লিটার জল ধরে); এই চিহ্নগুলি যে গভীর ও সুসমান তা ইঙ্গিত করে যে অতিকায় ডাইনোসরদের বেশী জলে দেহ অর্ধনিমগ্ন রাখতে হত না।

টেকসাসেই অন্যত্র তাদের পায়ের ছাপ আর একটি প্রচলিত ধারণায় আঘাত করেছে, যথা সাধারণ সরীসৃপ প্রকৃতি অনুসারে ডাইনোসররাও দলে বাস করত না, সেই রীতির সূচনা স্তন্যপায়ীদের থেকে। কিন্তু এই পায়ের ছাপগুলি দেখে বোঝা যায় অন্তত তেইশটি নাবালক ও পূর্ণবয়স্কদের একটি দল সোজা পথে সামনে এগিয়ে গিয়েছে—কোন জায়গা ছেড়ে কোন গন্তব্যে তা রহস্যময়, এক মতানুসারে আধুনিক স্তন্যপায়ীদের মত শ্যামলতর কোনও বিচরণ ক্ষেত্রের দিকে। তা ছাড়া এক দল ব্রন্টসরাসের পদচিহ্নে ভিতর দিকের ছাপগুলি ছোট, যেন বড় বড় পুরুষরা তরুণদের রক্ষা করতে ঘিরে রেখেছিল, যেমন হাতির পাল এখনও করে। এই ধরনের সন্তান প্রীতি বা গোষ্ঠী স্বার্থের প্রতি বিবেচনাও অবশ্য সরীসৃপ স্বভাব বহির্ভূত, কিন্তু তার আর একটি ক্ষীণ ইঙ্গিত এসেছে সুদূর মংগোলিয়ার গোবি মরু থেকে। ১৯২৩ সালে সেখানে প্রোসেরাটপ্‌সের ডিম আবিষ্কার হয়, আদিতে হয়তো তাদের সংখ্যা ছিল ৩০ কি তারও বেশী, একটি মাত্র প্রসূতির পক্ষে তা অত্যধিক; আর ছিল হাড়, সম্ভবত শতাধিক প্রোসেরাটপ্‌সের, যেন দল বেঁধে ডিম পাড়া হয়েছে। এমন যৌথ অণ্ড প্রসব প্রাণী জগতে বিরল, কিন্তু মংগোলিয়াতে যে ডিমের সঙ্গে শিশু ও জননীদেরও ফসিল বর্তমান ছিল তাও আশ্চর্য। এক আকস্মিক বালি-ঝড়ের কিছু নজির পাওয়া গিয়েছে, হয়তো তার কবলে পড়ে তারা সব এক সঙ্গে মরেছে, কিন্তু আধুনিক সরীসৃপ সমাজে ডিম ও সন্তান সাধারণত অবজ্ঞাত, বরং মাঝে মাঝে তারা জন্মদাত্রীর পেটে যায়। এখানে মায়েরা কাছাকাছি ছিল কেন?

সংঘবদ্ধতা, পারস্পরিক প্রীতি, উন্নত মস্তিষ্ক, উষ্ণ রক্ত, দৈহিক তৎপরতা, এই সবই সরীসৃপদের সম্বন্ধে আমরা যা জানি তার পরিপন্থী, উপরোক্ত বৈজ্ঞানিক বিচিন্তার এ যাবৎ যা নজির তা অনেকের দৃষ্টিতে অপেক্ষাকৃত সামান্য। ডাইনোসরদের সম্বন্ধে চিরাগত ধারণাগুলি হটিয়ে তা এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, কিন্তু এই সব দিকে নিঃসন্দেহে নব পরিবর্তনের হাওয়া বইছে। প্রচলিত বিশ্বাসে সন্দেহ রাখতে বিজ্ঞান সর্বদা প্রস্তুত বলেই তার অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে, নয়তো বদ্ধ ধারণার অন্ধকূপে আবদ্ধ থাকত তা। ডাইনোসররা নবীনতর প্রাণীদের তুলনায় নিশ্চয় বুদ্ধিতে খাটো ছিল, ইগুআনডনের ওজন প্রায় হাতির সমান হলেও মস্তিষ্ক মাত্র এক-বিশাংশ, কিন্তু এখন অনেকেরই বিশ্বাস তা বলে ডাইনোসরদের

আগে যতটা নির্বোধ বা নিষ্ক্রিয় ভাবা হয়েছে তাও ঠিক নয়। সুদীর্ঘ সরীসৃপ যুগে উদ্ভিদ জগতের সুতরাং খাদ্য বস্তুর পরিবর্তন সত্ত্বেও তারা চার মহাদেশে বৃদ্ধি পেয়েছে, তার মধ্যে পৃথিবীর তাপ উঠেছে নেমেছে, তবু তারা মংগোলিয়ার মরুতে চরম উত্তাপ এড়াতে শিখেছে, উত্তর আমেরিকার প্লাবন তাদের বাসভূমির অনেকটা নিশ্চিহ্ন করলেও অক্ষুণ্ণ থেকেছে, আফ্রিকার প্রান্তরে য়োরোপের বনে সুখে বাস করেছে, ১৩½ কোটি বছর ধরে প্রাণী জগতে নিরঙ্কুশ আধিপত্য করেছে—এত সব নিশ্চয় জৈব যোগ্যতায় হীনতার পরিচয় দেয় না।

তাই এ ধরার সর্বত্র থেকে প্রায়ই একই সঙ্গে তাদের আকস্মিক বিদায় আরও আশ্চর্য, মধ্যজীবীয় অধিকল্পের পর নবজীবীয়ের প্রথম দৃশ্য পেলিয়োসিন অধিযুগের স্তরে পৃথিবীর কোথাও একটিও ডাইনোসর ফসিল পাওয়া যায় নি। শুধু তাই নয়, এই সন্ধি ক্ষণে কোনও কারণে অন্যান্য নানা জীবেরও ক্ষতি হয়েছে—সপুষ্পক তরু লতার প্রায় অর্ধেক প্রজাতি, আকাশচর ও বৃহৎ জলচর সরীসৃপরা সব, অনেক আদিম জাতের স্তন্যপায়ী লোপ পেয়েছে, পক্ষান্তরে ভূতাত্ত্বিক কালের মাপে বলতে গেলে দেখতে দেখতে দেখা দিয়েছে নতুন স্তন্যপায়ী দল। তা ছাড়া মধ্যজীবীয় অধিকল্পের শেষে পৃথিবীর একমাত্র ভূখণ্ড বা অতিমহাদেশটির ভাঙন সম্পূর্ণ হয়ে তা বর্তমান মানচিত্রের ভূখণ্ডগুলিতে বিভক্ত হয়েছে। নবজীবীয় অধিকল্পের উদয় নানা পরিবর্তনে চিহ্নিত।

সরীসৃপ যুগের সমাপ্তি ও যুগপৎ স্তন্যপায়ী যুগের সূচনায় এই যে দুর্বোধ্য আকস্মিক পালা বদল তার উপর মন্তব্য করে জনৈক পুরাজীববিজ্ঞানী একটি নাটকীয় উপমা দিয়েছেন। অভিনয় চলছে, সব প্রধান ভূমিকায় সরীসৃপরা, বিশেষত ডাইনোসর কুল—হঠাৎ যবনিকা নেমে তৎক্ষণাৎ আবার উঠল, দেখা গেল একই দৃশ্য, কিন্তু অভিনেতারা সব নতুন, ডাইনোসর সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, অন্যান্য সরীসৃপ প্রায় 'মৃত সৈনিক', প্রধান অংশ আদিম স্তন্যপায়ীদের।

এই প্রধানরা অবশ্য তখন ছিল নিতান্তই ক্ষুদ্র ও আপাতদৃষ্টিতে অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু সে কথা পরে। আপাতত বিবেচ্য ডাইনোসররা হঠাৎ কেন উধাও হয়ে গেল। এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের জল্পনা কবির কল্পনাকেও হার মানায়। তাঁদের বিবিধ বিচিত্র প্রস্তাবের এক একটি প্রায় আজগুবীর পর্যায়ে পড়ে, যেমন ডাইনোসর ডিমের স্বাদ পেয়ে স্তন্যপায়ীরা দেখতে দেখতে তা খেয়ে তাদের নির্বংশ করেছে। তা ছাড়া প্রস্তাবিত হয়েছে যে জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে তারা সন্তান সৃজনে অক্ষম হয়ে পড়ল, আকস্মিক কোনও মহামারী রোগ সব বৃহৎ সরীসৃপদের আক্রমন করেছিল, অথবা প্রাণী যেমন বুড়ো হয়ে মরে

তেমনি সম্পূর্ণ ডাইনোসর পরিবার দীর্ঘ কাল পৃথিবী বাসের পর বার্ধক্যের কবলে পড়ে নিঃশেষ হয়েছে। কিংবা হয়তো অতিরিক্ত আয়তন বা মোটা বর্ম পৃথিবীর অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে বর্জন করা সম্ভব হল না—যার পক্ষে দেহের ভার জলে রক্ষা করা সহজ ছিল জল যখন শুকিয়ে গেল তখন সে যেন ডাঙায় জলে পড়ল। নয়তো পৃথিবীর জলবায়ু ঠাণ্ডা হতে হতে সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেল। অথবা উপযুক্ত খাদ্য কমে গিয়ে বিরাট উদরের পূর্তি ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠল, তখন আদি স্তন্যপায়ীদের ক্ষীণ দেহ ও ক্ষুদ্র ক্ষুধাই তাদের মস্ত সহায় হয়ে দাঁড়াল। উষ্ণ রক্ত বজায় রাখল দেহের তাপ, কিন্তু তার চেয়েও বড় সম্পদ ছিল তাদের মাথায়—হীনতম স্তন্যপায়ীর মস্তিষ্কও বৃহত্তম সরীসৃপের তুলনায় উন্নত ; শুধু মানুষ নয়, তার সবচেয়ে পরিচিত ও নিকটাত্মীয় প্রাণীরা তাদেরই দলে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিচিন্তা অত্যধিক শীতের কবলে পড়ে মৃত্যুর পক্ষপাতী। যদিও তখন তুষার যুগের বা প্রলম্বিত হিমের কোনও চিহ্ন নেই, তাপের আকস্মিক ও সংক্ষিপ্ত অধঃপতনে ডাইনোসর ও অন্যান্য অনেক জীব নিঃশেষ হয়ে থাকতে পারে। আমরা জানি বর্তমান সরীসৃপরা শীতল-শোণিত বলে শীত কালে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে থাকে যাতে শরীরের ইন্ধন কম খরচ করে দেহ-তাপ যথাসম্ভব বজায় রাখা যায়। এড্রিয়ান ডেজমন্ড বলছেন প্রায় সাত কোটি বছর আগে যখন জলবায়ু দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল, তখন কচ্ছপ, কুমির ইত্যাদি সরীসৃপরা আনাচে কানাচে দীর্ঘ শীত-নিদ্রায় ডুব মেরে প্রবল শীত ঋতুতেও বেঁচে রইল, প্রকাণ্ডরা উপযুক্ত আশ্রয়ের অভাবে মরে গেল। ক্ষুদ্র স্তন্যপায়ীরাও অনেকে শীতের পরীক্ষায় পাশ করে বড়দের উপর জিতল।

কিন্তু সহসা জগৎ জুড়ে বছরের পর বছর মারাত্মক হিমেল হাওয়া বয়েছে কেন ? এক আধুনিক প্রকল্প বলে এর সূত্র নিহিত সুদূর মহাকাশে। ১৯৬০ দশকের শেষ দিকে রাশিয়ার থেকে শোনা যায় যে ডাইনোসর বিলোপের কারণ তারার বিস্ফোরণ, পরে ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের কয়েক জন বিশেষজ্ঞ এর সমর্থনে যুক্তি দেখিয়েছেন। এক শ্রেণীর নক্ষত্র হঠাৎ অতি উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠে ফেটে পড়ে, কয়েক দিন ধরে দিনের আলোতেও দেখা যায় তাদের। গত ৪০০০ বছরে নানা দেশের মানুষ এ রকম সাতটি অতিনোভা দেখে তাদের কথা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছে; কিন্তু সাত কোটি বছর আগে এমন আশ্চর্য দৃশ্য নথিভুক্ত করার মত কেউ ছিল না পৃথিবীতে। এ যাবৎ লক্ষিত বিস্ফোরণের একটিও সৌর জগতের ১০০ আলোকবর্ষ পরিধির মধ্যে ঘটে নি বলে পৃথিবীর পরিবেশে পরিবর্তন হয় নি। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের হিসাবে গড়ে প্রতি পাঁচ কোটি বছরে একটি নিকট অতি-নোভার আবির্ভাব হতে পারে। এই গ্রহে মানুষের অস্তিত্ব অর্ধ কোটি বছরও নয়, কিন্তু

ডাইনোসরদের দীর্ঘ রাজত্ব কালে তা হলে এমন এক ঘটনা খুবই সম্ভব।

অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি নক্ষত্র ফেটে পড়লে তার ফল হবে দু রকম। চোখে-দেখা আলো ছাড়াও মহাজাগতিক রশ্মি, রঞ্জন রশ্মি, গামা রশ্মি ইত্যাদি সতেজ বিকিরণ ছড়াবে চার দিকে। তারা জীব দেহে ঢুকে কোষস্থিত বংশকণিকা জখম করে ক্ষতিকর মিউটেশন এবং মৃত্যুও ঘটাতে পারে। উপরন্তু, এক যুক্তিধারা অনুসারে প্রথমে পৃথিবীর মাটিতে প্রচণ্ড ও মারাত্মক গামা রশ্মি বর্ষণের পর রঞ্জন রশ্মির ঝাপটায় বায়ুমণ্ডলের এক অংশ উড়ে যাবে, ফলে পৃথিবীর গায়ে বায়ুর আবর্ত ও ঝড় উপরে ঠেলে তুলবে বাষ্পবাহী বাতাস, সেখানে তুষার-মেঘ জমে আটকাবে সূর্যের তাপ, সুতরাং পৃথিবীর সর্বত্র ঠাণ্ডা পড়বে। উষ্ণ জলবায়ুতে লালিত জীব কুলের এই সংকটে তা ছাড়া থাকবে অবারিত সৌর বিকিরণের অনিষ্ট—দুইয়ে মিলে আনবে মরণ বাঁচন সমস্যা। এ সম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট নজির নেই, যদিও আকস্মিক ও অল্পকালীন জলবায়ু পরিবর্তনের কিছু চিহ্ন আছে। এবং এই প্রকল্প অনুসারে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেই সব স্থলের জীব যাদের মধ্যে চরম আয়তন ও বিকাশ দেখা যায়, যথা বৃহৎ সপুষ্পক তরু ও ডাইনোসর গোষ্ঠী, যেমন ঘটেছে বাস্তবে।

কিন্তু সমস্যার সমাধান সন্ধানে বিজ্ঞানীরা মহাকাশে কেবল অতিনোভার দিকেই নজর দেন নি, ঐ প্রকল্পটি প্রবর্তনের বছর চারেক পরে দুই ভারতীয় বিজ্ঞানী ইংল্যানড থেকে প্রস্তাব করেন যে পৃথিবীর সঙ্গে ধূমকেতুর সংঘর্ষের ফলে তার গ্যাস বাতাসের সঙ্গে মিশে বিস্ফোরক বস্তু তৈরি হয়, আকাশের বিদ্যুতে তা জ্বলে ওঠে এবং সেই বিস্ফোরণে বিবিধ প্রাণী প্রজাতি অকস্মাৎ নির্বংশ হয়েছে হয়তো। আরও এক তত্ত্ব অনুসারে দৈহিক ক্ষতি ঘটে থাকতে পারে পার্থিব চুম্বকী ক্ষেত্রের পরিবর্তনে। আমরা জানি যে পৃথিবী এক বিশাল চুম্বক, জীব কুলে তার উপকারিতা এই যে মারাত্মক মহাজাগতিক রশ্মি ও সৌর-শিখা-জাত বিদ্যুৎবাহী পরমাণু-কণারা চুম্বকী আকর্ষণ বিকর্ষণের ফাঁদে পড়ে বিপথে চলে যায়। কিন্তু এই চুম্বকী ক্ষেত্র কয়েক বার উলটে গিয়েছে, অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ মেরু পরস্পরের স্থান দখল করেছে ; এই বদলের মাঝামাঝি এক সময়ে লোপ পেয়েছে আকর্ষণ বিকর্ষণ, তার ফলে মহাকাশের উপরোক্ত কণাগুলি জীব দেহে অনিষ্টকর মিউটেশনের সৃষ্টি করেছে, হয়তো সম্পূর্ণ প্রজাতির ধ্বংস এনেছে। এরা পরোক্ষেও এই বিনাশ ঘটিয়ে থাকতে পারে—পৃথিবীকে ঘিরে যে ওজোন গ্যাসের বর্ম আছে তা ভেঙে ফেলে অতিবেগনি রশ্মির পথ পরিষ্কার করে দিয়ে।

১৯৭৭ সালে সোভিয়েট বিজ্ঞানী ভি. এলিসিয়েভ আবার আমাদের পৃথিবীর মাটিতে

ফিরিয়ে আনলেন এক পরিচিত রোগের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে। রোগটির নাম রিকেট্‌স্‌, এতে ক্যালসিয়ামের সংযোগে অস্থি গঠনের প্রক্রিয়াটা বিকল হয়ে হাড় হয়ে পড়ে সরু, দুর্বল ও বিকৃত, তখন দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এলিসিয়েভ বলেন সাত থেকে আট কোটি বছর আগে পৃথিবীর আবহাওয়া আর্দ্র হয়ে ওঠে, সুতরাং বৃষ্টিতে ধুয়ে ব্যবহার্য ক্যালসিয়াম কমে যায়, তাতে ডাইনোসর দেহে হাড়ের কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ে। এই তত্ত্বের সমর্থনে তাঁর নজির হল যে কংগো দেশের বৃষ্টিধৌত জঙ্গলের জন্তুরা তাদের প্রান্তর-বাসী ভাইদের তুলনায় খর্বদেহ। তা ছাড়া জানা আছে যে মধ্যজীবীয় অধিকল্পের শেষ ভাগে ডাইনোসররা যে সব ডিম রেখে গিয়েছে তার খোসাগুলি খুব পাতলা, ক্যালসিয়ামের অভাবে তা সম্ভব। এলিসিয়েভ দাবি করেন যে এই অন্তিম ডাইনোসরদের কঙ্কালও বাস্তবিক বিকৃত।

সম্প্রতি হীন শেওলার মধ্যেও ডাইনোসর লুপ্তির ব্যাখ্যা খোঁজা হয়েছে। মধ্য-জীবীয়ের শেষ কাল থেকে এই দলীয় সামুদ্রিক উদ্ভিদের অনেক প্রজাতি নাকি ফসিলে অনুপস্থিত, সমুদ্রের আকস্মিক সংকোচনে তারা মরে গিয়ে থাকতে পারে। এই সব ভাসমান উদ্ভিদ বাতাসে অনেকটা অক্সিজেন যোগায় আঙ্গারিক গ্যাস থেকে তা বানিয়ে। সুতরাং তারা কমে গেলে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনও কমেছে, তার ফলেও ক্ষুদ্রদেহীদের তুলনায় বৃহৎ জীবদেরই ক্ষতি হবে বেশী। অনেকটা একই যুক্তি থেকে শুরু করে জনৈক মার্কিন বিজ্ঞানী বলছেন তারা দম আটকে মরে নি, মরেছে অত্যধিক তাপে। সমুদ্র সরে গিয়ে শেওলা কমে অব্যবহারে বাতাসে আঙ্গারিক গ্যাস জমেছে, আকাশে তার পর্দা রৌদ্রতপ্ত পৃথিবীর উত্তাপ বিচ্ছুরিত হতে বাধা দিয়েছে, ফলে পৃথিবী গরম হয়েছে ; উষ্ণ সমুদ্র তখন জলে মিশ্রিত আঙ্গারিক গ্যাসও ত্যাগ করেছে, তাতে আকাশের পর্দাটা আরও ভারী হয়ে পৃথিবী উষ্ণতর হয়েছে। বড় প্রাণীর শরীর জুড়ানো বেশী কঠিন, তাপ হয়তো ডাইনোসরদের প্রত্যক্ষ মৃত্যু ঘটাবার মত বাড়ে নি, কিন্তু প্রজনন ব্যবস্থার ক্ষতি আরও সহজে হয় এবং তা ব্যাহত হ'লে অবশ্য বংশের বাতি নিভে আসবে।

সতর্ক পাঠকরা লক্ষ্য করে থাকবেন যে অত্যধিক শীত ও তাপ দুইই আছে জল্পনায় এবং দুইয়েরই অল্প স্বল্প নজির খুঁজে বার করা হয়েছে। বিজ্ঞানে এ রকম মজাদার পরিস্থিতি কিছু আশ্চর্য নয়। সব কিছু বিবেচনা করে এখন পর্যন্ত মনে হয় জলবায়ুর কোনও বৈপ্লবিক পরিবর্তন এবং তার ফলাফলই ডাইনোসর অন্তর্ধানের সম্ভাব্যতম ব্যাখ্যা, যদিও এই বিপ্লবের কারণ সম্বন্ধে এ যাবৎ কোনও স্পষ্ট নির্দেশ নেই। ডাইনোসররা তাদের অন্যান্য রহস্যের সঙ্গে এই শেষ প্রশ্নটির জবাবও গোপন রেখেছে।

এদের নিয়ে এখানে দু কথা লেখা হল কয়েকটি কারণে। এরা নিঃসন্দেহে মধ্যজীবীয় অধিকল্পের প্রধান প্রাণী; এবং যুগ যুগ ধরে জীবের বিকাশ ও বিনাশের যে লীলা চলছে পৃথিবীর মঞ্চে, পালা শেষ হলে প্রবল ও প্রকাণ্ডও বিদায় নেবে সেখান থেকে—এই সত্যের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ডাইনোসর পরিবার। এই বিলোপের নানা ব্যাখ্যায় বৈজ্ঞানিক জল্পনা যে আকাশ পাতাল পৃথক পথে একই প্রশ্নের নিষ্পত্তি খুঁজতে পারে, আমরা তারও দৃষ্টান্ত পাই। তা ছাড়া এই আজব জীবদের সম্বন্ধে সাধারণ লোকের বিশেষ কৌতূহল, এবং কিছু ভুল ধারণাও গড়ে উঠেছে প্রধানত কতগুলি আজগুবী চলচ্চিত্রের কল্যাণে। এই ধারার সূত্রপাত করে 1 Million B. C. নামক ছবিটি যাতে দেখি ১০ লক্ষ বছর আগে মানুষ ডাইনোসরদের সঙ্গে লড়ছে. যদিও তখন সাত কোটি বছর ধরে তারা নির্বংশ। চাঞ্চল্য ও রোমহর্ষের নিচে বাস্তব যে কোথায় চাপা পড়েছে অধিকাংশ দর্শক তা টেরও পায় নি, ছবির নির্মাতারা পয়সা করেছে। হলিউডের অনুকরণে জাপান বানাল গড্‌জিলা, তাতে সমুদ্র থেকে উঠে এল এক বিরাট বিকট টিরানোসরাস, ধ্বংস করল আধুনিক মহানগর। এই ছবিতে তবু একটা ভান ছিল যে একটি মাত্র ডাইনোসর কোনও গতিকে সমুদ্রগর্ভে এ যুগ পর্যন্ত টিকে রয়েছে, সাধারণত তাও থাকে না।

ডাইনোসর ও সরীসৃপরা মধ্যজীবীয়ে প্রধান হলেও এই অধিকল্পে জীব জগতে আরও দুটি গুরুতর নতুন পথ খুলেছে—মাঝামাঝি সময়ে প্রাণী কুলে সরীসৃপ থেকে অভিব্যক্ত হয়েছে পাখি, শেষের দিকে উদ্ভিদ সমাজে দেখা দিয়েছে ফুল। এত কাল প্রাণী দেহের বহিরাবরণ ছিল খোলস, আঁশ বা মসৃণ ত্বক, এই প্রথম দেখা দিল পালক। তা ছাড়া দেহ-তাপ স্থির রাখার নিখুঁত ব্যবস্থা তাদের মধ্যেই প্রথম বিকাশ পেয়েছে। ডাইনোসররা সে দিকে কিছুটা এগিয়ে থেকে থাকলেও পাখির মত কার্যকর পদ্ধতি ছিল না তাদের। পালকসজ্জিত প্রথম পাখির নাম হয়েছে আর্কিওপ্টেরিক্‌স ('প্রাচীনপক্ষ'), তার ঠোঁটে তখনও দাঁত, দেহ দাঁড়কাকের সমান। তারা দেখা দেয় ১৮ কোটি বছর আগে, তার বহু কোটি বছর পরেও আকাশ ছিল সরীসৃপদের দখলে। পালকের পাখা অনেক বেশী কার্যকর, তা দিয়ে হাওয়া কেটে অনায়াসে দূর দূরান্তরে পাড়ি দেয় পাখিরা।

পাখির অভিব্যক্তি সম্বন্ধে একটি মত এই যে তাদের জন্মদাতা এক জাতের গেছো সরীসৃপ যাদের দু পাশে সামনের ও পিছনের পা জুড়ে বর্তমান উড়ো কাঠবিড়ালির মত চামড়ার পাত দেখা দিয়েছিল, তাতে ভর করে তারা গাছ থেকে গাছে ঝাঁপ দিত অথবা শত্রু এড়াতে লাফ মারত। দ্বিতীয় ধারণা অনুসারে পাখির পূর্বপুরুষরা ভূমিচর সরীসৃপ.

ঐ রকম চামড়ার 'পাখার' সাহায্যে দ্রুতগতি পতঙ্গ বা অন্য শিকার ধরতে তারা ক্রমশ দীর্ঘতর লাফ মারতে শিখেছে। প্রথম মতটি অধিকাংশের সমর্থন পেয়ে থাকলেও আর্কিওপ্টেরিক্সের নভশ্চর সরীসৃপ পুরোগামীরা হয়তো গাছ বা পাহাড়ে না চড়ে মাটি থেকেই উড়েছে এই ধারণার এখন কিছু সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে, তার একটি আমরা আগে উল্লেখ করেছি।

পুরাজীবীয় কালে উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি হয়েছে প্রথমে স্পোর ও পরে বীজ থেকে। বীজবাহী উদ্ভিদে পুং পরাগ বাতাসে ভর করে তরুর এক অংশ থেকে অন্য অংশে ডিম-কোষ নিষিক্ত (fertilize) করলে বীজ সৃষ্টি হত, এই ব্যবস্থা স্পোর বিস্তারের চেয়ে নিশ্চিত হলেও তার নির্ভর খেয়ালী হাওয়ার উপর। এর পর ক্রিটেশাস কল্পে হঠাৎ উদ্ভিদ জগতে অভিব্যক্তি আর এক মস্ত ধাপ এগিয়ে গেল ফুলের আবির্ভাবে, তখন পাপড়ির মৃদু দোলায় বা কীট পতঙ্গের সামান্য ঠেলায় পরাগ কাছাকাছি সন্নিবিষ্ট ডিম-কোষকে নিষিক্ত করেছে, অথবা একই প্রজাতির ভিন্ন ফুলেও কীট পতঙ্গ পরাগ বয়ে নিয়ে গিয়েছে গায়ে পায়ে পাখায় মেখে। ফুল থেকে ফল, তাতে বীজ। এই পুষ্পিত তরু লতারা পৃথিবীর চেহারা ফিরিয়ে দিল, আদিম ফুলে সম্ভবত গন্ধ ছিল না, রংও সাধারণ সবুজ, হলদে বা সাদা, কিন্তু অবিলম্বে উজ্জ্বল বর্ণ বৈচিত্র্য ও গাঢ় গন্ধ মেলে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হল—উদ্দেশ্য অবশ্য উপযুক্ত কীট পতঙ্গকে আকর্ষণ করে কাছে আনা, তাতে উদ্ভিদের হবে বংশবৃদ্ধি, অতিথিরা পাবে তাদের খাদ্য মধু ও পরাগ।

আমরা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণী বলে গর্বিত, এসেছি স্তন্যপায়ীদের ধারা বহন করে, সুতরাং তাদের ক্রমবিকাশে আমাদের বিশেষ আকর্ষণ ও কৌতূহল। মধ্যজীবীয়ের প্রথম কল্পে ডাইনোসরদের আবির্ভাবের অল্প পরে আদিতম স্তন্যপায়ীরা দেখা দিয়েছে, পক্ষী কুলের আগেই তারাও জন্ম নিয়েছে সরীসৃপদের থেকে—আধুনিক মতে যে এদের মধ্যে স্তন্যপায়ী-সদৃশরা অন্য সরীসৃপদের কাছে হেরে যাওয়ার আগে খাঁটি দুগ্ধপোষ্যদের সৃষ্টি করেছে গিয়েছে তা আমরা আগে দেখেছি। কিন্তু বহু কোটি বছর এই নবাগতরা রইল নিতান্তই নগণ্য, অবশেষে সুদীর্ঘ ডাইনোসর আধিপত্যের অবসানে নবজীবীয় অধিকল্পে দেখতে দেখতে আরম্ভ হল তাদের প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনার বিকাশ। মধ্যজীবীয়ে সরীসৃপ যুগের পর নবজীবীয় অধিকল্প প্রকৃত পক্ষে স্তন্যপায়ী যুগ।

এই নব যুগের ঊষায় তাদের বংশতরু অবিলম্বে বিচিত্র শাখা মেলেছে। মেরুদণ্ড-হীনদের খোলস, মৎস্য পরিবারের আঁশ, সরীসৃপদের মসৃণ ত্বকের পর গায়ে লোম

নিয়ে এল তারা। পাখিদের মত স্তন্যপায়ীরাও উষ্ণ-শোণিত, কিন্তু তারা ডিমের পর্ব চুকিয়ে দিয়েছে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় সোজা মায়ের পেট থেকে। তবে এই উত্তরণের মাঝখানে গোটা দুই অদ্ভুত ধাপ লক্ষ্য করা যায়, এক পর্বে সম্ভবত দেখা দিয়েছে বর্তমান হংসচঞ্চু প্ল্যাটাইপাস ও কাঁটাদার পিপীলিকাভুক্‌দের পূর্বপুরুষ, এই আদিম জন্তুরাও লোমাবৃত এবং বাচ্চারা দুগ্ধপোষ্য, কিন্তু তারা বার হয় ডিম থেকে। তার পর সম্ভবত ক্যাঙারু জাতীয় প্রাণীদের জন্মদাতারা আরও এক ধাপ এগিয়েছিল, তারা বাচ্চাই প্রসব করে, কিন্তু শিশুরা এত ছোট্ট ও কাঁচা যে মায়ের পেটের বাইরে এক থলিতে কিছু কাল কাটাতে হয়। প্রায় এদেরই সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিয়েছে প্রধান স্তন্যপায়ী শাখাটি, তাদের ডিম বা থলির বালাই নেই।

ফসিলের অভাবে মধ্যজীবীয় অর্থাৎ আদিতম স্তন্যপায়ীদের ক্রমবিকাশ এখনও খুব স্পষ্ট নয়, কিন্তু তাদের পাওয়া গিয়েছে দূর দূরান্তরে, যেমন চীন, উত্তর আমেরিকা ইংল্যানড ও দক্ষিণ আফ্রিকা দেশে। ১৯৬২ ও ১৯৬৬ সালে শেষোক্ত দেশে প্রাপ্ত প্রায় সম্পূর্ণ দুটি কঙ্কাল ১৮ কোটি বছরের কাছাকাছি প্রাচীন। প্রাণী দুটিই ছিল ১৮ সেনটিমিটারের কম লম্বা, চেহারায় আধুনিক ছুঁচোর সঙ্গে মিল, প্ল্যাটাইপাসের মত তারাও সম্ভবত ডিম পেড়েছে। প্রশ্ন হল যে স্তন্যপায়ীদের বুদ্ধি, দক্ষতা, মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা যদি সরীসৃপদের চেয়ে উন্নত হয় তবে দীর্ঘ কাল ধরে ঐ হীনতর প্রাণীরা বিদায় নেওয়ার অপেক্ষায় তারা শুধু মাত্র টিকে রইল কেন, নবজীবীয়ের শুরু থেকে তাদের দেহের আয়তন ও শক্তির যে দ্রুত বৃদ্ধি দেখা যায় তা ১১ কোটি বছর স্থগিত থেকেছে কেন। এর নানা কারণ সন্দেহ করা হয়েছে—স্তন্যপায়ী-সদৃশ সরীসৃপদের মত তাদেরও দেহ ঠাণ্ডা করবার ভাল ব্যবস্থা ছিল না, ডিম-প্রসবী আদিম স্তন্যপায়ীদের এখনও তা নেই ; অথবা মধ্যজীবীয়ের শেষ দিকে পুষ্পিত তরু লতার আবির্ভাবে তারা পেয়েছে নানা তৃণ ও শস্য, শাক সবজি ফল ইত্যাদি বিচিত্র খাদ্য যা এখন সারা জগতে নিরামিষাশী প্রাণীদের আহার্য ; নয়তো বিশাল, প্রবল ও হিংস্র ডাইনোসর গোষ্ঠীর সঙ্গে তারা পেরে ওঠে নি।

যাই হক, এই নতুন যুগে তখন সরীসৃপ থাকল শুধু সাপ, কচ্ছপ এবং কুমির ও গিরগিটি টিকটিকি জাতীয় তার ছোট সংস্করণ। ক্ষুদ্রদেহ স্তন্যপায়ীরা আনাচে কানাচে যে যেখানে ছিল এই বার বেরিয়ে এল, যেন সুযোগের খবর পেয়ে, যেন উজ্জ্বল ভবিতব্যের ইশারা দেখে। তাদের নিয়ে যথারীতি শুরু হল প্রকৃতির পরীক্ষা। আদি নবজীবীয়রা অধিকাংশই পরবর্তী পরিচিত দুগ্ধপোষ্যদের প্রত্যক্ষ পূর্বপুরুষ নয়, শুধু ভাবী কালের ধারাগুলি মোটামুটি নির্দেশ করেছে তারা। প্রথম অধিযুগ পেলিয়োসিনের

প্রাণীরা এসেছিল ছোট মগজ নিয়ে, তাদের মুখ, দাঁত ও পাও খুব কার্যকর ছিল না, অবিলম্বে লোপ পেয়ে তারা যোগ্যতরদের জায়গা করেছে। পেলিয়োসিনে কেউ কেউ দেখা দিয়েছিল পায়ে খুর নিয়ে, যে দলে পরে গরু ঘোড়া ছাগল ভেড়ার আবির্ভাব হয়েছে ; প্রথম থেকেই তাদের উদ্ভিজ্জ খাদ্যের অভাব ছিল না, কিন্তু অভাব ছিল দেহে আধুনিক গরু ভেড়ার মত একাধিক পাকস্থলীর যা থাকলে এক বারে অনেকটা খেয়ে অবসর মত আবার চাঁবিতের চর্বণ সম্ভব। বর্তমান ঘোড়া বা হরিণ যেমন নখে ভর করে ছোটে তাও পারে নি তারা।

এই উদ্ভিদভুক্‌দের খেয়ে বেঁচেছে যারা তাদের মধ্যেও পরীক্ষা চলল, এল কুকুর বিড়াল হায়নার মত প্রাণী। কারও ছিল ধারালো পাতের মত দাঁত যেমন আছে এ কালের মাংসাশীদের, আবার কারও বা দাঁত অদ্ভুত ভোঁতা ; কারও তীক্ষ্ণ ছুঁচালো নখ, কারও তা চ্যাপটা। দেহের মাপে যারা আধুনিক মাংসাহারীদের সমান তারা মগজের আয়তনে তাদের অর্ধেক পর্যন্তও পৌঁছায় নি। পেলিয়োসিন স্তন্যপায়ীদের মধ্যে যে দলটি পরে উৎকৃষ্টতম মস্তিষ্ক পেয়েছে তারা তখন মোটেই শ্রদ্ধাজনক ছিল না। প্রাইমেট বর্গের প্রথম প্রাণী এই প্রোসিমিয়ানদের সূত্র ধরে পরে বানর, বনমানুষ, মানুষ এসেছে, কিন্তু সে কালে তারা যখন দেখা দিল তখন দেহের মাপ ছিল বড় ইঁদুরের মত।

এই অধিযুগে গরু ও ঘোড়ার দূর প্রপিতামহ আড়াই মিটার লম্বা ব্যারিল্যাম্‌ডা দেখা দিয়েছে, পরবর্তী ইয়োসিন অধিযুগে এল গণ্ডার ও উটের পূর্বপুরুষ এবং ঘোড়ার নিকটতর জন্মদাতা কিন্তু তাদের চেহারায় এই সম্পর্ক ধরা প্রায় অসম্ভব। উট, ঘোড়া ও গণ্ডারের এই আদি সংস্করণগুলি মাপে যথাক্রমে প্রায় খরগোশ, বাচ্চা কুকুর ও পূর্ণবয়স্ক কুকুরের সমান ; তা ছাড়া উটের কুঁজ ও গণ্ডারের শিং তখনও দেখা দেয় নি, ঘোড়া প্রায় খুরহীন। কিন্তু পরবর্তী অলিগোসিন অধিযুগে চেহারায় ও আয়তনে অনেকটা ক্ষতিপূরণ হল, বিশেষত গণ্ডার পরিবারে তখন এমন দানবের আবির্ভাব হয়েছে স্তন্যপায়ী কুলের ইতিহাসে যার তুলনা নেই, এদের একটি ব্যালুচিথেরিয়াম তিমির পরেই এ যাবৎ পৃথিবীর বৃহত্তম দুগ্ধপোষ্য, লম্বায় সাড়ে সাত মিটারের বেশী, সাড়ে পাঁচ মিটার উঁচু। সাহারার পূর্ব প্রান্তে মিশরের ফায়ুম অঞ্চলে অলিগোসিন ফসিলের সমৃদ্ধ খনি আবিষ্কার হয়েছে, সেই অধিযুগে স্তন্যপায়ী কুলের দ্রুত অভিব্যক্তি ও অগ্রগতির অনেক খবর দিয়েছে তা, তখন এই মরু ছিল আর্দ্র শ্যামল বনভূমি। তিন মিটার দীর্ঘ মোএরিথেরিয়াম স্থলে ও জলে বিচরণ করত, তার ঈষৎ লম্বা উপরের ঠোঁট পরে নাকের সঙ্গে জুড়ে ক্রমশ বাড়তে বাড়তে হাতির শুঁড়ে পরিণত হয়েছে। ছিল প্রায় তিন মিটার
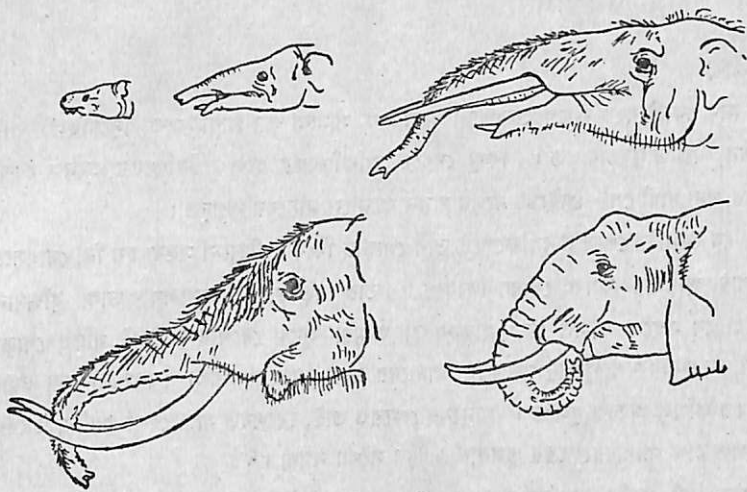
চিত্র ১২। হাতির ক্রমবিকাশ।

লম্বা ও দু মিটারের কাছাকাছি উঁচু আর্সিনোথেরিয়াম, মাথায় পাশাপাশি এক জোড়া ভয়ানক শিং, জন্তুটি দেখতে গণ্ডারের মত, কিন্তু তার বংশাবলী অনির্দিষ্ট।

এই ধরনের পশুর পাশাপাশি অলিগোসিন অধিযুগে ফায়ুমে বাস করেছে উন্নততর প্রাইমেট, যেমন ঈজিপ্‌টোপিথেকাস, দেহে অনেকটা ছোট হয়েও সে বেশী কৌতূহল-জনক, কারণ সেই জগতের সম্ভবত সবচেয়ে চতুর প্রাণী সে এবং তাকে বনমানুষ ও মানুষের যৌথ পূর্বপুরুষ বলে সন্দেহ করা হয়েছে। এই অধিযুগেই বনমানুষের আবির্ভাব, তার পর নবতম আগন্তুক মানুষের অপেক্ষা—তার আগে কত শত প্রাণী এল গেল, তার সামান্য আভাস পেলাম আমরা।

এখন দেখা দরকার প্রাথমিক প্রাইমেট থেকে বানর ও বনমানুষের পথে প্রাণীশ্রেষ্ঠ নরের দিকে অগ্রগতি কেমন করে সম্ভব হয়েছে, কোন পরিকল্পনায় প্রকৃতি মানুষ গড়ার কাজ শুরু করেছে।

৫। নর ও বানর

প্রায় সাত কোটি বছর আগে স্তন্যপায়ী কুলে এক সামান্য ক্ষুদ্র প্রাণী জন্ম নিয়েছিল, তার আকার আকৃতি ছুঁচোর মত। কিন্তু দেখতে অকিঞ্চিৎকর হলেও কিঞ্চিতের অনেক বেশী কিছুর জন্য দায়ী সে—প্রাইমেট বর্গের পত্তন করে সে মানুষের অগ্রদূত।

যে ডালটির শেষে মানুষ ফলেছে তার গোড়ার দিকে পৌঁছানো সম্ভব হয় নি, যোগসূত্রে জায়গায় জায়গায় ফাঁক থেকে গিয়েছে। তার বড় কারণ ফসিলের অভাব, বুদ্ধিমান প্রাণীরা যে সহজে ফসিল রেখে যায় না তা আমরা আগে দেখেছি। তাই যদিও ঘোড়া বা হাতির ক্রমবিকাশ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে আমাদের জানা আছে, গরিলা শিমপানজি বা ওরাং ওটাঙের ফসিল অত্যন্ত দুর্লভ। মানুষের ক্ষেত্রেও তাই, বিশেষত যারা বেশী প্রাচীন, তাদের সৃষ্ট লক্ষ লক্ষ পাথুরে অস্ত্রের তুলনায় অস্থির সংখ্যা নগণ্য।

স্তন্যপায়ী শ্রেণীর নানা বর্গ, কিন্তু মানুষের বংশাবলী তৈরির চেষ্টায় তাদের প্রায় সবাইকে বাদ দিতে হয়েছে, কারণ মানবিক ক্রমবিকাশের প্রথম দিকে তাদের স্থান দিতে গেলে কোনও না কোনও অসংগতি দেখা যায়, সব কিছু ঠিক খাপ খায় না। এই ধরনের বাধা সবচেয়ে কম প্রাইমেট বর্গে, তার মধ্যে প্রাথমিক হীনতর প্রাণীদের স্থান প্রোসিমিয়ান উপবর্গে, তাদের আবির্ভাব নবজীবীয়ের প্রথম অধিযুগ পেলিয়োসিনে, হয়তো আরও কিছু আগে, তাদেরই অলিগোসিন বংশধর বানর ও বনমানুষ নররূপী প্রাইমেট দলীয়।

প্রোসিমিয়ানদের সূত্র অনুসরণ করে আমরা একেবারে গোড়ায় যাকে চিনি সে গেছো ছুঁচো, নামটি এসেছে চেহারার থেকে, তা ছাড়া সাধারণ ছুঁচোর মত সে পোকা খেতে ভালবাসে। মগজ একটি আখরোটের সমান। হয়তো বৃহত্তর জন্তুদের ভয়ে গেছো জীবন ধরেছিল তারা। খাদ্যে তাদের প্রতিযোগী ছোট খাটো অপ্রাইমেট স্তন্যপায়ীরা। বিশেষজ্ঞরা খাঁচার গেছো ছুঁচোর মধ্যে কাম ক্রোধ লোভ এই তিন রিপুর তাড়না লক্ষ্য করেছেন, এক খাঁচায় দুটি পুরুষকে রাখলে একটি নির্ঘাত খুন হবে। এক নৃবিজ্ঞানীর মতে এই আতিশয্য অসংযত মানবিক আচরণের ব্যঙ্গ রূপ। চেহারা ও পোকার প্রতি আকর্ষণ দেখে প্রথমে তাদের প্রাইমেট বর্গের বাইরে ছুঁচো জাতীয় কীটভুক্‌দের দলে রাখা হয়েছিল, কিন্তু পরে চোখ ঘিরে গোল হাড় ও খুলির অন্যান্য অংশের গঠন লক্ষ্য করে প্রাইমেট পরিবারের একেবারে নিচের তলায় স্থান দেওয়া হয়েছে। তবু দোতলায় যারা আছে তাদের সঙ্গে এত

চিত্র ১৩। স্তন্যপায়ী থেকে মানুষের বংশতরু।

পার্থক্য যে গেছো ছুঁচোরা যেন এক দিকে এই উর্ধ্বতরদের অন্য দিকে অপ্রাইমেট স্তন্যপায়ীদের মধ্যে সেতু রচনা করেছে—এই কারণেই বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে যদিও ফসিল বিশেষ কিছু পাওয়া যায় নি, এই ক্ষুদ্র হীন প্রাণীটির আদি প্রতিনিধি আজকের অসামান্য বিচিত্র প্রাইমেট বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

পরবর্তী অনেক প্রোসিমিয়ানদেরও এখন দেশে দেশে দেখা যায়, যথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মালয়, ফিলিপিন্‌স, ইন্‌দোনেশিয়া ইত্যাদি দ্বীপে লেমুর গোষ্ঠী, ভারতে লরিস, আফ্রিকায় পোটো। ইয়োসিন অধিযুগে প্রোসিমিয়ানদের আকার ও অন্যান্য বিশেষত্বে বৈচিত্র্য বাড়ল। বর্তমান লেমুরের নানা গণ অনুসারে নানা মাপ, মুষিক-লেমুর মাত্র ১২-১৩ সেনটিমিটার, ইঁদুর বা ছুঁচোর মতই চতুষ্পদ, প্রধানত কীটভুক্‌ ; আবার সওয়া মিটার উঁচু ইন্‌দ্রি বৃহত্তম প্রোসিমিয়ান, পাতা ফল কুঁড়ি ইত্যাদি খায় এবং বানরের মত সোজা হয়ে বসে, চলতেও হাতের ব্যবহার কম। আধুনিক টার্সিয়ার মাপে বড় ইঁদুরের সমান, নিশাচর জীবনে কাজে লাগে প্রকাণ্ড দুটি গোল চোখ এবং বড় বড় কান, লম্বা হাত পায়ে তারা ডালে ডালে লাফিয়ে বেড়ায় ব্যাঙের মত, ছোট খাটো সরীসৃপ শিকার করে। মাথাটি সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে পিছন দিকে তাকাবার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে টার্সিয়ারের।
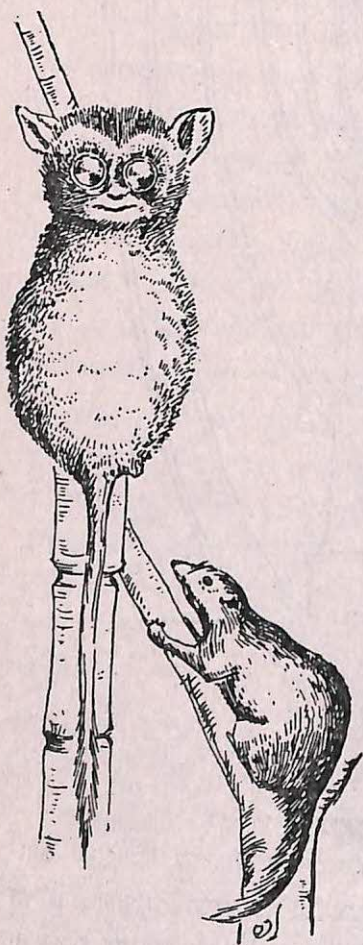
চিত্র ১৪। উপরে টার্সিয়ার, নিচে গেছো ছুঁচো।

ক্রমবিকাশের পথে লেমুর ও টার্সিয়ারের দুটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ লক্ষণীয়। তাদের মুখ গেছো ছুঁচোর মত ছুঁচালো নয়, অনেকটা চ্যাপটা, নাক বসে গিয়ে চোখ মাথার দু পাশ থেকে সরে এসেছে সামনের দিকে, তার ফলে কোনটা আগে কোনটা পিছনে তা বিচার করা সহজ, যা আমরা এক চোখে পারি না। সুতরাং গেছো ছুঁচো ও অনেক স্তন্যপায়ীর তুলনায় তাদের জগতে ঘ্রাণের চেয়ে গুরুতর ইন্দ্রিয় দৃষ্টি। দ্বিতীয়ত, বুড়ো আঙুল সরে

ফাঁক হয়ে যাওয়াতে ডাল বা অন্য কিছু হাতে জড়িয়ে ধরা সম্ভব হল। প্রোসিমিয়ানরা চেহারায় মানুষের এমন কি বানরের থেকে বেশ কিছুটা বিভিন্ন হলেও এই সব বিষয়ে তারা আমাদের দিকে এগিয়ে এসেছে। হাতে ধরে খাওয়া, হাত দিয়ে পরীক্ষা করা ইত্যাদি কুশলতা মস্তিষ্কের উন্নতিকে সাহায্য করেছে, তার ফলে আবার দৃষ্টি ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের অধিকতর উৎকর্ষের পথ তৈরি হয়েছে।

প্রোসিমিয়ানদের পরের ধাপ বানর, তার পর বনমানুষ, তাদের বিকাশ প্রায় তিন কোটি বছর পরে। কোন প্রোসিমিয়ান থেকে বানরের উদ্ভব তা সঠিক জানা নেই। আমেরিকা মহাদেশ (তথাকথিত নবজগৎ) ও পৃথিবীর অন্যত্র তাদের এখন অনেক প্রজাতি, অধিকাংশই বৃক্ষবাসী, বেবুন ভূমিচর। শুধু চেহারায় নয় স্বভাবেও নর ও বানরের নিকট সম্পর্ক প্রতীয়মান। সব কিছু নেড়ে চেড়ে পরীক্ষা করবার যে অদম্য কৌতূহল দেখা যায় তাদের মধ্যে তা উন্নততর হস্তকুশলতা ও মস্তিষ্কের পরিচায়ক। বানর ও বনমানুষের উদ্ভবে মানুষের দিকে অগ্রগতি কতটা হল তার সন্ধানে যেতে হবে আজ থেকে প্রায় চার কোটি বছর আগে যখন বড়, ভারী প্রাইমেট দেখা দিতে লাগল, তাদের বাহু দীর্ঘ, দক্ষতর। প্রোসিমিয়ানদের মত তারাও বৃক্ষচর, খাদ্য রুচি অনুসারে তারা বন জঙ্গলের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন শ্রেণীর ডালে ডালে ছুটোছুটি করত, লম্বা লেজটিও প্রায় হাতের মত কাজে লাগাত ডাল জড়িয়ে ধরতে—তারা হল বানর। যাদের বাহু দীর্ঘতর তাদের স্বভাবটা গেল গাছ থেকে পাড়া, ডাল ধরে দোলা এবং ঝুলে ঝুলে চলার দিকে। মাথা আকাশের দিকে পা মাটির দিকে রেখে তারা হাতে ঝুলে দুলতে দুলতে এগিয়ে চলে, হাত বদলের সময়ে দেহটি ঘুরে যায়—তারা বনমানুষ।

দূরের সরু ডালে দাঁড়ানো কঠিন, বনমানুষ সেখানে পৌঁছায় শরীর সোজা রেখে শুধু হাতের জোরে ঝুলে ঝুলে, বানর ডাল থেকে ডালে লাফ দেয় দেহ কাত করে, লম্বা লেজটি তখন অনেকটা হালের কাজ করে। বানরের তুলনায় বনমানুষ বেশী ভূমিচর, দেহ খাড়া রেখে ডালে ডালে ঝুলে চলার ফলে মাটিতে নেমেও প্রায় সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখল সে, অনাবশ্যক লেজটা হারাল, বুকের ছাতি বাড়ল, হাত দিয়ে ধরবার ক্ষমতা এবং চোখ ও হাতের মধ্যে সহযোগিতা আরও উন্নত হল। বস্তুত বাংলায় বনমানুষ শব্দটি তাদের উপযুক্ত নাম।

গাছ থেকে মাটিতে নামলে বানর সাধারণত চার পায়ে চললেও প্রায়ই দেহ খাড়া করে রাখে, যেমন ঘুমের বা খাওয়ার সময়ে, শত্রুর খোঁজে দূর পর্যন্ত নজর করতে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, হাতে কিছু থাকলে দু পায়ে কিছুটা হাঁটে, যদিও ছুটতে হলে তা ফেলে দিয়ে চার পায়ে

দৌড়ায়। বনমানুষ অল্প দূর পর্যন্ত দু পায়ে চলতে পারে, যদিও সেই চলন মানুষের মত সহজ নয়, পায়ের পাতার ধারে ভর করে কুঁজো হয়ে হাঁটে সে এবং মাঝে মাঝে মাটিতে হাত ঠেকায়, তখন হাত ভাঁজ করে আঙুলের পিঠ মাটিতে ফেলে, হাতের পাতা থাকে ভিতরের দিকে (বানর অন্যান্য জন্তুর মত হাতের পাতায় ভর করে চলে)। বনমানুষ যখন হাঁটে তখন তার হাতের কলা হাতেই থাকে, দুই হাত মুক্ত হওয়ার ফলে ক্রমে নানা ব্যবহারের ভিতর দিয়ে নানা দিকে তাদের কুশলতা বাড়ল—অর্থাৎ মানুষের দিকে পদক্ষেপ। এই সব পরিবর্তন অবশ্য নিজের ইচ্ছায় ঘটে নি, পরিপার্শ্বের প্রভাবে বহু কাল ধরে অতি ধীরে অভিব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু তাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা গুরুত্বপূর্ণ। হাতের বিভিন্ন ব্যবহার, নানা বিষয়ে হাতের উপর নির্ভরতার থেকে মগজও বাড়ল, তা আবার হস্তকুশলতার সহায়ক হল। ফলে বনমানুষের বুদ্ধি বানরের চেয়ে অনেক বেশী এবং এর গোড়ায় আছে হাতের মুক্তি, অর্থাৎ দ্বিপদ গতি। এই দৈহিক বিপ্লবের সূত্র ধরে মানুষ ক্রমে আরও অনেক সুবিধা পেয়েছে, কিন্তু সেই আলোচনা পরে।

বানর প্রধানত পত্রভুক্‌, বনমানুষ ফল পছন্দ করে। তারা গাছ থেকে মাটিতে নেমে থাকতে পারে খাবারের খোঁজে, গাছের ফল বীজ পাতা মাটিতে পড়েছে, হয়তো তা সংগ্রহ করতে নেমে দেখেছে উপরন্তু গাছের নিচে এবং ফাঁকে ফাঁকে নানা রকম সুস্বাদু ছোট খাটো তরু লতা, তৃণ, পোকা ইত্যাদিও পাওয়া যায়, সুতরাং অধিক কাল কাটিয়েছে সেখানে। গরিলা, শিমপানজি, ওরাং ওটাং ও গিবন বর্তমান জগতের বনমানুষ। গিবন ও ওরাং এশিয়াবাসী, মাঝে মাঝে মাটিতে নামলেও তারা প্রধানত গাছেই থাকে। ডালে ডালে ঝুলে চলতে সবচেয়ে পারদর্শী বনমানুষ গিবন, তারই বাংলা নাম উল্লুক, আকারে ও ওজনে সে অনেক জাতের বানরের চেয়েও ছোট, তা ছাড়া গেছো জীবনে দক্ষতা অন্যান্য বনমানুষদের চেয়ে বৃক্ষচর বানরদের সঙ্গেই তার সাদৃশ্য নির্দেশ করে। ওরাংও প্রধানত বৃক্ষবাসী, কিন্তু সেখানে ছুটোছুটি কম করে গিবনের চেয়ে, এবং সহজে দেখা দেয় না, মাটিতে চলনটা আনাড়ী, বেঢপ। ওরাং এখন বোর্নিওর ঘন জঙ্গলে ও সুমাত্রা দ্বীপের উত্তর প্রান্তে সীমিত, সংখ্যা পাঁচ হাজারেরও কম—এর জন্য দায়ী শিকারী মানুষ, সে তাদের বন্দী করে এনেছে প্রধানত চিড়িয়াখানার খাঁচায় ভরে রাখতে। ওরাঙের মুখের ভাব এক এক সময়ে এতই মানুষের মত যে বোর্নিওবাসীরা তাদের নাম দিয়েছে 'বানর মানুষ'।

শিমপানজি ও গরিলার বাস আফ্রিকার জঙ্গলে, তারা মাটিতে অনেক সহজে চলা ফেরা করে, যদিও শিমপানজি প্রায় তিন-চতুর্থাংশ সময় গাছে কাটায়। সেখানে সংগ্রহ করে তাদের প্রধান খাদ্য ফল, গরিলারা কলা গাছ, মাটির কাছাকাছি গাছের ফল,

শাঁস ইত্যাদি চিবায়, বিশাল বপুর দাবি মেটাতে তাতে দিনের ছয় থেকে আট ঘণ্টা কাটে। বাচ্চা গরিলারা গাছে চড়লেও বড়রা এত ভারী যে বেশী উ'চুতে উঠলে ডাল ভেঙে অধঃপতনের ভয় আছে বলে তারা প্রায় সম্পূর্ণ ভূমিচর, 'মাটির মানুষ'। পূর্ণ-বয়স্ক পুরুষদের দেহ প্রায় দু মিটার দীর্ঘ, ২০০ কিলোগ্র্যামের কাছাকাছি ভারী, শিমপানজি ওজনে বড়জোর তার তিন ভাগের এক ভাগ। গরিলা, শিমপানজি ও ওরাং দিনের শেষে ডাল পাতা দিয়ে বাসা বানায় শুধু একটি রাত কাটাতে, গরিলার বাসাটি নিচের দিকে, কখনও বা মাটিতেই। চিড়িয়াখানার বন্দী গরিলার মধ্যেও এই আদিম প্রবৃত্তি দেখা যায়, যদিও সেখানে ঘুমের সুব্যবস্থা থাকে। শিমপানজি সাধারণত বনবাসী হলেও বনের প্রান্তে অপেক্ষাকৃত খোলা জমিতেও বিচরণ করে। গাছে কখনও চার হাত পায়ে, কখনও শুধু দু পায়ে, কখনও বা ঝুলে চলে। শিমপানজি ও গরিলা প্রায়ই মাটিতে দু পায়ে চলে, তখন পা ও ঘাড় বেঁকে থাকে, সম্পূর্ণ খাড়া হতে পারে না তারা, সোজা দ্বিপদ গতি একান্ত মানবিক বৈশিষ্ট্য।

বৃক্ষ জীবন ছেড়ে ভূমিবাসের পরিণতি সুদূরপ্রসারী, এখানে আমরা একের পর এক পর্দা ফাঁক করে সেই সুদূরে শেষ পর্যন্ত মানুষের দিকে উ'কি দিতে পারি। ডাল ধরতে না হওয়ায় হাত দুটি যে খালি হয়ে গেল তাতে সম্ভব হল আক্রমণ বা আত্মরক্ষায় অস্ত্র (পাথর, ডাল) বয়ে বেড়ানো, পরে সে অস্ত্র নিজের হাতে তৈরি করা। গাছের আশ্রয় ছেড়ে খোলা জমিতে বিপদের আশঙ্কা ও আত্মরক্ষার প্রয়োজন বেশী—দরকার হল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও বর্ণ পার্থক্য ধরবার শক্তি, বিচার বুদ্ধি, সদাজাগ্রত চেতনা, দ্রুত চিন্তার ক্ষমতা, শিকারে দক্ষতা, গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন। এর ফলে ভাবের আদান প্রদান ও সহযোগিতা অবশ্যম্ভাবী, তার জন্য আবার দরকার নতুন নতুন বুদ্ধি ও তা প্রকাশের ভাষা। একান্ত ফলমূলাহারী অভ্যাস ছেড়ে মানুষকে হতে হল আমিষাশী, প্রায় সর্বভুক্। আগে দাঁত ছিল প্রধান অস্ত্র, যখন পাথরের সাহায্যে কাটা ছে'ড়া সম্ভব হল তখন দাঁত আর কামড়ের পেশী হয়ে গেল ছোট, ফলে মুখ চ্যাপটা হয়ে তার পাশবিক ভাবটা কমে গেল। এ সব সংস্কার আবার একে অন্যকে সাহায্য করল, সব মিলে রসদ যোগাল মস্তিষ্ক বিকাশের।

আপাতত বনমানুষের জগতে ফিরে গিয়ে মানুষের সঙ্গে তাদের তুলনায় দেখি প্রতিটি হাড়ের তুল্য বিকল্প অস্থি পাওয়া যাবে তাদের দেহে, রক্ত চলাচলের প্রক্রিয়া ও মাংসপেশীও অনুরূপ। মানুষের মত বনমানুষও লাঙ্গুলবিহীন, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অন্যান্য আঙুলের বিপরীত বলে হাত দিয়ে সে আমাদেরই মত ধরতে পারে। স্ত্রীদের দুটি

মাত্র স্তন, মাসিক ঋতু বিবর্তন। মগজের মাপ কিছুটা বিভিন্ন হলেও বেশ বড়, অবশ্য তার যে অংশ মনন শক্তির সঙ্গে যুক্ত ও চিন্তার সমন্বয় স্থাপন করে তা মানুষে বৃহত্তর। তা ছাড়া মানুষের ছেদক দন্ত (canine) ছোট, চিবুক ও বুড়ো আঙ্‌ল বড়, পা বেশী সোজা, গায়ের লোম পরিমাণে কম ও দৈর্ঘ্যে ছোট।

আকৃতির পরে প্রকৃতিতেও বনমানুষের সঙ্গে আমাদের সাদৃশ্য লক্ষ্য করতে বনে যাওয়ার দরকার করে না, চিড়িয়াখানাই যথেষ্ট। সেখানে এদের অঙ্গ ভঙ্গি ও সামাজিক ব্যবহার দেখে আমরা অবাক হই, মুগ্ধ হই সন্তান বাৎসল্য লক্ষ্য করে। ওরাং মাতা যখন ছেলেকে কোলে বসিয়ে দোল দেয়, মাথায় হাত বুলায়, চুমো খায়, তখন যেমন মানুষ মায়ের কথাই মনে পড়ে, তেমনি আবার ওরাং বা শিমপানজির খাঁচার সামনে হয়তো হঠাৎ কোনও পরিচিত লোকের মুখ ভেসে ওঠে।

বনমানুষের সঙ্গে মানুষের সাদৃশ্য বিশেষ লক্ষ্য করা যায় যারা বুদ্ধিতে খাটো বা হাবা তাদের অথবা শিশুদের দেখে—কারণ মানুষের মধ্যে এরা পূর্ণ বিকাশ পায় নি। সদ্যোজাত শিশুকে দেখতে যে এক এক সময়ে প্রায় অমানুষিক মনে হয় এবং বানর বাচ্চার সঙ্গে তার প্রভেদ যে খুব স্পষ্ট নয় তার কারণ বুঝতে জানা দরকার প্রকৃতির এক আশ্চর্য নিয়ম। এর ফলে প্রতি প্রাণীকে মাতৃগর্ভে তার সম্পূর্ণ ইতিহাসের ভিতর দিয়ে এসে ভূমিষ্ঠ হতে হয়—অতীত এমনই আঁকড়ে আছে সকলকে। মানুষকেও মাত্র ন মাসে সেরে ফেলতে হয় ৩৫০ কোটি বৎসরব্যাপী ধীর অভিব্যক্তির পুনরাবৃত্তি, এ যেন প্রকাণ্ড ইতিহাস গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণটা বারে বারে ঝালিয়ে নেওয়া। সেই আদিম সাগরে জীবাণুর মত একটি কোষ থেকে আরম্ভ করে মাছ সরীসৃপ বানর সদৃশ আকৃতির ভিতর দিয়ে ভ্রূণ এসে পৌঁছায় শিশুতে, ভূমিষ্ঠ হয়ে সেও হামাগুড়ি দিয়ে স্মরণ করায় চতুষ্পদ পিতামহদের। আশ্চর্য নয় যে তার পা তখনও বানরের মত ভিতর দিকে ভাঁজ করা, পায়ের বুড়ো আঙ্‌ল তখনও চঞ্চল কি কেন ধরবার আগ্রহে···গাছের ডালই বুঝি। আশ্চর্য এই যে ক্রমবিকাশের অনুকূলে এমন প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য সত্ত্বেও অনেকে তাতে বিশ্বাস করেন নি। এবং এও সত্য যে এত শক্ত ভিতের উপর যে মতবাদ গড়ে উঠেছে, মাত্র একটি বিরুদ্ধ প্রমাণের আবিষ্কারে তা তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ত। কারবনিফেরাস কল্পের বন থেকে যে কয়লার সৃষ্টি আজও যদি তার স্তরে পুরামানবের সামান্য একটি দাঁত উদঘাটিত হয়ে জোর গলায় জানিয়ে দেয় যে ডাইনোসরদের আগে তার জন্ম তবে ঠিক তাই ঘটবে। কিন্তু শুধু মানুষেরই নয়, আর কোনও প্রাণীরও এমন কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় নি যা ক্রমবিকাশের কাঠামোতে তার স্থান থেকে তাকে বিচ্যুত

করতে পারে। তেমন সাক্ষ্য কিছু থাকলে এ পর্যন্ত কি একটিরও দেখা মিলত না ?

বর্তমান বনমানুষরা কে আমাদের নিকটতম তা বিজ্ঞানীদের এক গবেষণার বিষয়। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে গরিলা ও শিমপানজি যত না কাছাকাছি ওরাং ও গিবনের, তার চেয়ে বেশী কাছাকাছি মানুষের। আকারে অনেকটা বৈষম্য সত্ত্বেও শারীরিক গঠনে শিমপানজি ও গরিলা পরস্পরের অনুরূপ, কিন্তু অনেকটা পার্থক্য স্বভাবে আচরণে। গরিলা দামী জন্তু বলে অনেক চিড়িয়াখানায় নেই, কিন্তু সেখানে যারা শিমপানজির ভাব ভঙ্গি ও আমোদপ্রিয়তা লক্ষ্য করেছে অথবা ছবিতে দেখেছে সে সাহেবী সাজ পরে টেবিলে বসে চা খাচ্ছে, তারা হয়তো বিনা দ্বিধায় আমাদের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের সম্মানটা তাকেই দেবে। দেখা গিয়েছে গরিলা ও ওরাং এই তামাসায় অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে, শিমপানজির কাছে তা খুবই মজার ব্যাপার। তারা যে বাহাদুরি দেখিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাহবা পেতে উৎসুক, বিশেষত তরুণ বয়সে, তার আরও অনেক উদাহরণ আছে। তাদের সিগারেট খেতে, সাইকেল চালাতে শেখানো হয়েছে, ১৯৬৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লরিডায় পুলিশ এক শিমপানজিকে গ্রেপ্তার করে অত্যধিক দ্রুত গাড়ি চালাবার অপরাধে—আসলে সে কেবল স্টিয়ারিং চাকাটি ঘোরাচ্ছিল হাতে, পায়ের কাজ করছিল তার মালিক। তা ছাড়া বিছানা বালিশ তৈরির এক কারখানায় শুধু কৃতিত্ব দেখাবার জন্য তাদের দিয়ে মাল ভর্তি করানো হয়েছে। গরিলার দ্বারা এ সব কাজ কল্পনা করা যায় না, তার মানে অবশ্য এই নয় যে তাদের বুদ্ধি কম—শুধু স্বভাবটা আলাদা। বিজ্ঞানীদের হিসাবে বাচ্চা শিমপানজি বুদ্ধিতে মানব শিশুর সমকক্ষ, যত কাল সে কথা বলতে না শেখে।

অবশ্য সাম্প্রতিক কালে শিমপানজির মুখে ভাষা ফোটাবার অনেক চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তা খুব সফল হয় নি, কারণ গলায় যে গঠনের সাহায্যে মানুষ নানা স্বর সৃষ্টি করে তা বনমানুষদের নেই। তবে সাংকেতিক ভাষায় শিমপানজিরা অনেক কথা বলতে শিখেছে, পরে গরিলা সম্বন্ধেও এই দাবি করা হয়েছে। মার্কিন মনোবিজ্ঞানী কীথ্ ও ক্যাথি হেজ্ দম্পতির ছিল এক লালিতা 'কন্যা' ভিকি, তাকে তাঁরা জন্ম থেকে মানব শিশুর মত যত্নে 'মানুষ' করেছেন। তাঁদের চেষ্টায় ভিকি 'মামা' 'পাপা' 'আপ' ও 'কাপ' এই চারটি মাত্র কথা বলতে শিখল, কিন্তু শিক্ষকদের অনুকরণে মুখের বিভিন্ন অংশ ছোঁয়া, হাততালি দেওয়া ইত্যাদি আয়ত্ত করল, শিখল অনেক ঘরোয়া কাজ, যেমন নিজের হাত না পুড়িয়ে দেশলাই জেলে সিগারেট ধরিয়ে দেওয়া, ধোয়া কাপড় মুচড়ে জল বার করা, মেঝে ঘষে সাফ করা এবং মোছা, করাত ও স্ক্রু-ড্রাইভারের মত যন্ত্র ব্যবহার করা। প্রথমে সে সমবয়সী মানব শিশুর চেয়ে দ্রুত শিখল, চার বয়সে দুইয়ের অবস্থা

সমকক্ষ, তার পর ভাষার অভাবে অতিরিক্ত শিক্ষণেও ভিকির আর উন্নতি হল না। অন্যত্র তরুণ শিমপানজিরা হাত ও অন্যান্য অঙ্গের বিশেষ সংকেতে সহজ কথা প্রকাশ করতে শিখেছে, যেমন কলা খাব বা জল খাব। ছোটদের সেই খেলা যাতে নানা আকারের গর্তে অনুরূপ গোঁজ ঢোকাতে হয় তাও তারা আয়ত্ত করেছে, তিন বছর বয়সে নাকি এই ধাঁধার সমাধান করা মানুষের চেয়ে শিমপানজির পক্ষে সহজ।

শিমপানজিরা রং তুলি দিয়ে ছবি আঁকতে শিখেছে, অন্তত একটি গরিলা, ওরাং ওটাং ও কাপুচিন বানরদের দিয়েও তা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু শিমপানজিরাই অবশ্য সবচেয়ে উৎসাহী ও সহযোগী। তারা আপন খেয়ালে যা আঁকে তা তিন চার বছর বয়স্ক মানব শিশুর সৃষ্টির তুল্য এমন অভিমত দেখা যায়। এক ইংরেজ প্রাণীবিজ্ঞানী কংগো নামক এক বালক শিমপানজির শিল্প দু বছরের বেশী সমীক্ষা করে তাঁর বইতে লিখেছেন যে শিমপানজিরা ছবি আঁকে অনেকটা মানব শিশুদের মতই। দেড় বছর বয়সে কংগো যখন আঁকতে আরম্ভ করল তখন সে ভাল করে তুলি ধরতে জানত না, তার পর বুড়ো আঙুল ও তর্জনীর মধ্যে মানুষের মতই তা ধরতে শিখল। শিল্প সৃষ্টিতে উৎসাহ হারাবার আগে সে চাকার মত রেখা টেনে তার ভিতরে নানা রকম দাগ দিয়েছে, মুখ আঁকবার ঠিক আগে মানুষের শিশুরা যেমন করে। এই বিজ্ঞানী মন্তব্য করেছেন যে শিমপানজির শিল্প অর্থহীন হিজিবিজি নয়, তার মধ্যে আকৃতি-জ্ঞান ও ব্যক্তিগত ধারা লক্ষ্য করা যায়। প্রসিদ্ধতর জীববিজ্ঞানী জুলিয়ান হাক্স্লির মতে শিমপানজিদের শিল্প সম্ভাবনা আছে, প্রকাশ পায় সুযোগ পেলে এবং এই প্রাথমিক সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ দেখি মানুষে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য জনৈক পর্যবেক্ষকের বর্ণিত এক আশ্চর্য দৃশ্য—একটি শিমপানজি ১৫ মিনিট ধরে স্থির হয়ে বসে আফ্রিকার সূর্যাস্ত দেখছিল, পশ্চিমাকাশে নানা রঙের খেলা তাদের পালা শেষ করে যত ক্ষণ না অন্ধকারে মিলিয়ে গেল তত ক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে ছিল সে।

সাইকেল চালানো, গর্তে উপযুক্ত আকারের গোঁজ বসানো, সংকেতে ভাব প্রকাশ, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি ক্ষমতা বনমানুষদের মধ্যে কৌতূহলোদ্দীপক সন্দেহ নেই, কিছু হয়তো মানুষের অভিব্যক্তিও বুঝতে সাহায্য করে, কিন্তু বিজ্ঞানীর গবেষণাগারে বা তত্ত্বাবধানে অর্জিত এই সব শিক্ষা তাদের স্বাভাবিক বন্য পরিবেশে কাজে লাগে না। সেখানে তারা যে বুদ্ধি খাটিয়ে উদর পূর্তি, আত্মরক্ষা ইত্যাদি দিনগত সমস্যার বিহিত করে তাই তাদের যোগ্যতার প্রকৃত পরিচয়। মানুষের সঙ্গে তুলনা করতেও প্রকৃতির কোলে বনমানুষ সমাজের সমীক্ষা প্রয়োজন, বিজ্ঞানীরা এই কঠিন কাজেও এগিয়েছেন। শিমপানজিরা দল বেঁধে

ঘোরে, স্বাভাবিক ক্ষেত্রে এই সব সম্প্রদায়ের অনুশীলন থেকে জানা গিয়েছে সন্তান তার মায়ের সঙ্গে থাকে অন্তত চার পাঁচ বছর, তা মানুষ ছাড়া আর সব প্রাইমেটের চেয়ে বেশী। পরেও জননীর যোগাযোগ থাকে, বিশেষত কন্যাদের সঙ্গে, পুত্ররাও মাঝে মাঝে ফিরে এসে সস্নেহে মাকে সম্ভাষণ করে। বাপ সংসারের বাইরে, পুরুষরা কখনও শুধু নিজেরা, কখনও মাদীদের নিয়ে দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। মা ও ছেলের মধ্যে সম্ভবত যৌন সংগম হয় না, ভাই বোনেও হয় কিনা সন্দেহ। শিমপানজিরা তাদের খাদ্য ভাগাভাগি করে খায়, তা অবশ্য প্রাইমেটদের সাধারণ রীতি।

জেন গুডল নামে এক তরুণী ট্যান্‌জানিয়ার অরণ্যে শিমপানজিদের সম্বন্ধে অনেক অমূল্য ও আশ্চর্য তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এই বনবাসীরা প্রথমে অনেক দিন পর্যন্ত তাঁকে দেখলেই সরে গিয়েছে, এই বাধা কাটিয়ে তাদের স্বাভাবিক কার্যকলাপের ব্যাঘাত না করে ১০-১২ মিটার পর্যন্ত কাছে আসতে কেটে গেল ১৪ মাস। পরিশেষে শ্রীমতী তাঁর অসীম ধৈর্যের পুরস্কার পেলেন যখন শিমপানজিদের ভয় সম্পূর্ণ ভাঙল, তারা তাঁকে দলের লোক বলে মেনে নিল, তিনি তাদের লোম থেকে জংলী কাঁটা বাছলেন, তারাও তাঁর চুল খুঁটে খুঁটে তা তুলে দিল। তার পর তিনি স্বাভাবিক পরিবেশে শিমপানজিদের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে একের পর এক নতুন আবিষ্কার করেছেন, তার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তারা ডাল থেকে পাতা ছাড়িয়ে তা দিয়ে গায়ের কাদা পরিষ্কার করে অথবা কলার গায়ে মাখা মধু মুছে ফেলে। পাতা অল্প চিবিয়ে তা জলে চুবিয়ে তুলে জল খায়, হয়তো গাছের ফোকর থেকে ; এই উপায়ে এক হাতের আঙুল ডুবিয়ে যা ওঠে তার সাত আট গুণ বেশী জল তোলা যায়।

উই ঢিবি থেকে পোকা বার করে খাওয়ার ফন্দি আরও চমকপ্রদ। প্রথমে শিম-পানজি সযত্নে সরু ডাল, তৃণ বা লতা সংগ্রহ করে হাত বা মুখ দিয়ে তাদের পাতা ছাড়ায় এবং ১৫-৩০ সেনটিমিটার লম্বা কাঠি তৈরি করে. পরীক্ষায় কখনও কখনও তাদের অনেক-গুলি বাদ পড়ে, অনুমোদিত অস্ত্রটি ঢিবির উপরকার মাটি সরিয়ে গর্ত উন্মুক্ত করে তাতে ঢুকিয়ে দেয়, উইরা তা কামড়ে ধরলে আস্তে আস্তে সেটি বার করে ঠোঁট দিয়ে চেটে মুখে ভরে। কাঠির মাথাটা ব্যবহারে বেঁকে গেলে শিকারী সেটুকু বারে বারে ভেঙে ফেলে, অবশেষে যখন তা বেশী ছোট হয়ে পড়ে তখন নতুন অস্ত্র বানিয়ে নেয়। শ্রীমতী গুডল দেখেছেন একটি পুরুষ এক কাঠি মুখে নিয়ে প্রায় এক কিলোমিটার পথ ধরে একের পর এক ছ'টি ঢিবি পরীক্ষা করে দেখল একটিও উই শিকারের উপযুক্ত হয় নি।

বনমানুষরা যে ডাল বা পাথর হাতে নিয়ে ঘোরায়, কখনও বা ছোঁড়ে, পাথর ঠুকে

বাদাম ভাঙে তাও সুবিদিত। এ দিকে বিজ্ঞানীরা যে সব গুণের খাতিরে মানুষকে অন্যান্য প্রাণীর থেকে আলাদা করে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন তার একটি হল যন্ত্রের সৃষ্টি ও ব্যবহার। শিমপানজির ঐ কাঠি যন্ত্র তো বটেই, পাতা ছাড়িয়ে কাজের উপযুক্ত করে নেওয়া প্রায় সৃষ্টি বলা যেতে পারে। শিমপানজিরা এই ক্ষেত্রে অনেকটা এগিয়েছে, তবু এখানে একটি গুরুতর পার্থক্য আছে—উই ঢিবি চোখের সামনে দেখে শিমপানজি তার থেকে খাদ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছে, কিন্তু আদি মানব যখন পাথর ভেঙে ধারালো অস্ত্র বানিয়েছে তখন তার শিকার ছিল কেবল ভবিষ্যতের কল্পনায়। বিজ্ঞানীরা বলেন যন্ত্রের সৃষ্টিতে এই দূরদর্শিতাই মানবত্বের নির্ণায়ক। অনেকে আরও বলেন মানুষ হাতিয়ার বানিয়েছে সুনির্দিষ্ট আকৃতি অনুযায়ী। বস্তুত বনমানুষের চেয়ে হীনতর প্রাণীদেরও মাঝে মাঝে অস্ত্র উপকরণ দিয়ে কার্য সাধন করতে দেখা যায়, যেমন সামুদ্রিক ভোঁদড় পাথর দিয়ে শামুক ভাঙে, কাঠঠোকরা গাছের কাঁটা দিয়ে পোকা খোঁচায়। তবু শিমপানজি যখন শুধুমাত্র পাওয়া জিনিস কাজে লাগাচ্ছে না, তা সংস্কার করে উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপযুক্ত করে নিচ্ছে, তখন আমরা তার কৃতিত্বের তারিফ না করে পারি না।

দাঁতও এক রকম অস্ত্র, ভূমিচর প্রাণীদের শত্রু বেশী, তাই হয়তো বেবুন ও গরিলা পুরুষদের লম্বা প্রখর ছেদক দাঁত আছে, আমাদের বনমানুষ পূর্বপুরুষ যখন গাছ ছেড়ে মাটিতে নামল তখনও নিশ্চয় তার এই ধরনের অস্ত্র দরকার হয়েছিল, ক্রমে হাতিয়ার বানাতে শিখে অপ্রয়োজনে ছেদক দাঁত অন্যান্য দাঁতের সমান হয়ে গেল। শিমপানজি অনেকটা সময় মাটিতে থাকে বলেই হয়তো তার মধ্যে উপকরণ সৃষ্টি ও প্রয়োগের ঝোঁক দেখা যায় (প্রাইমেট ছাড়াও অসংখ্য জন্তু অবশ্য ভূমিচর, কিন্তু তাদের বানর বনমানুষের মত ধরবার উপযুক্ত হাত ও আঙুল নেই), যদিও মানুষের তুলনায় তা অনেক ক্ষীণ এবং তার ছেদক দাঁত অপেক্ষাকৃত বড়। সে আমাদের অনেক পিছনে, শিমপানজি কোনও দিন মানুষ হবে না, তার এক বড় কারণ যে ভাষার অভাব তা আমরা দেখেছি। তা ছাড়া মানব শিশুরও মগজ বানর বা বনমানুষের তুলনায় অনেক জটিল ও সম্ভাবনাপূর্ণ, ফলে শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের ক্ষমতাও অনেক বেশী।

শিক্ষার ক্ষমতা অবশ্য হীনতর প্রাণীদের মধ্যেও দেখা যায়, জীববিজ্ঞানীরা খাবারের লোভ দেখিয়ে ইঁদুর এমন কি মাছদেরও ছোট খাটো সমস্যার সমাধান করতে শিখিয়ে থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যাপক হ্যারি হার্লো বানরদের শিখিয়েছেন বিভিন্ন বস্তুর নানা আকৃতি ও রঙের পার্থক্য চিনে তাদের একটির নিচে ঢাকা লোভনীয় খাদ্য উদ্ধার করতে। শিক্ষা আরম্ভ হল শুধু দু রকম আকৃতির বা রঙের বস্তু দিয়ে, সেগুলি তুলে তুলে দেখে ভুল

বুঝতে বুঝতে ক্রমে অধিকতর সংখ্যা আয়ত্ত করল ছাত্ররা। এই ক্ষমতা বানরের জন্মগত নয়, চিন্তা শক্তির প্রয়োগে অর্জিত এবং এক বছর কিংবা আরও বেশী দিন শিক্ষাটি তারা মনে রাখে। মানুষও শৈশবে এমনি ভুল করে করে শেখে। তা ছাড়া বানর শিশুদের মধ্যে তিনি মানুষের নানা মানসিক রোগের একান্ত অনুরূপ মনোবিকার লক্ষ্য করেছেন, অন্য বাচ্চাদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখলে অথবা মাতৃস্নেহ যথেষ্ট না পেলে তা প্রকাশ পায়। এই স্নেহের অভাবে তাদের আক্রমন বৃত্তি বাড়ে, অকালপক্ব যৌন প্রবৃত্তি দেখা দেয়। বন্দী শিমপানজি শৈশবেও হিংস্র হয়ে উঠতে পারে এবং তাদের আঁকা ছবিতে এই সব বিকারের চিহ্ন দেখা যায় বলে দাবি করেছেন মানব শিশু শিল্পের তাৎপর্য বিশ্লেষণে বিশেষজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীরা। বানর বা বনমানুষের থেকে মানুষ আরও ধীরে ধীরে বাড়ে বলে তাদের শিশুর সঙ্গে তুলনীয় আমাদের বালক বালিকারা, তাদের মধ্যে এই ধরনের বিকার সুপরিচিত।

শিমপানজি সম্বন্ধে এত বলার পর, বিশেষত তার বুদ্ধি, ক্ষমতা এবং সম্ভাব্য সৌন্দর্য বোধের আভাস পেয়ে মনে হতে পারে বনমানুষদের মধ্যে তার মত আপন জন আমাদের আর কেউ নেই, বিশেষত গরিলা তো নয়ই। কিন্তু গরিলা সম্বন্ধে আমরা এত বেশী জানি না বলেই তার দাবি অগ্রাহ্য করা চলে না। এই অজ্ঞানতার কারণ তার স্বভাবটা সম্পূর্ণ বিপরীত – মেজাজ গম্ভীর, কাছাকাছি মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীর আগমন সে আদৌ পছন্দ করে না। শিমপানজির মুখে যেমন নানা ভাব, বিশেষ করে খুশি, সহজেই ফুটে ওঠে, গরিলার সেই সুবাদ নেই। সাধারণের ধারণা সে এক অতীব ভীতিকর হিংস্র উগ্র দানব যে শুধু খুনের আনন্দেই খুন করে, শিকারের বা গল্পের বইতে শিল্পীর কল্পনাও এই রকম চেহারাই গড়ে তোলে। এই মূর্তি যে একেবারে হেতুহীন তা না। যেমন লম্বা তেমন চওড়া লোমশ দেহ গরিলার, প্রকাণ্ড দাঁত, বিশাল বুক, উত্তেজিত হলে দু হাতে যখন সে তা চাপড়ায় তখন ঢাক বাদ্যের মত সেই নিনাদ বন কাঁপিয়ে দেড় কিলোমিটার দূর পর্যন্ত পৌঁছায়। কিন্তু আসলে সে অনেক সময়ে বুক বাজায় নিজে ভয় পেয়ে, স্বভাবে সাধারণত শান্ত নিরামিষাশী প্রাণী সে। এই সব নতুন তথ্য সম্প্রতি প্রকাশ পাচ্ছে, এত কাল যে গরিলা সম্বন্ধে খাঁটি কথা বেশী কিছু জানা ছিল না তার এক কারণ ঘোর আঁধার অরণ্যে তাদের বাস, দ্বিতীয়ত চলতি ধারণার ফলে তাদের ভাল করে বুঝতে কেউ সাহস করে কাছে যায় নি, বড়জোর দূর থেকে গুলি চালিয়েছে।

বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার উদ্দেশ্যে সাম্প্রতিক কালে যাঁরা এগিয়ে গিয়েছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখনীয় যুক্তরাষ্ট্রের উইস্‌কন্‌সিন বিশ্ববিদ্যালয়ের জর্জ শ্যালার। তিনি সস্ত্রীক

গিয়েছিলেন কংগো ও উগান্ডার সন্ধি স্থলে, জায়গাটা পাহাড়ী গরিলার স্বাভাবিক বাস ভূমি, যদিও এখন তাদের লুপ্তির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, মানুষ জায়গা দখল করে গোচারণ ক্ষেত্র বানাচ্ছে বলে ক্রমেই তাদের উঁচুতে সরে যেতে হচ্ছে। সেখানে ১৯৫৯-৬০ সালে শ্যালার দম্পতি প্রায় দেড় বছর ছিলেন, অনেকটা কাল জঙ্গলের ধারে মাঠে এক কুটিরে। প্রতি দিন শ্যালার বেরিয়ে পড়তেন গরিলার খোঁজে, যা দেখেছেন তা লিপিবদ্ধ করেছেন দু-খানি চমৎকার বইতে, বন্য গরিলা সম্বন্ধে আজ আমরা যা জেনেছি তার অধিকাংশই আছে সেখানে।

প্রথম দিকে তাঁর আগমনে তাদের মধ্যে জাগত বিস্ময় ও ত্রাস, সাধারণত তাঁকে দেখলে এক মরদ উঠে দাঁড়িয়ে গর্জনে বিপদের সংকেত জানাত অথবা ভয় দেখাতে বুক চাপড়াত, তার পর স্ত্রীদের বাচ্চাদের নিয়ে গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যেত। ক্রমে তারা যখন বুঝল যে ভয়ের কারণ নেই তখন তার বদলে দেখা দিল কৌতূহল, যেমন শ্যালার তাদের দেখে-ছেন তেমনি তারাও তাঁকে লক্ষ্য করেছে, ছোটরা প্রকাশ্যে, বড়রা অনেকটা গোপনে—মানুষের সমাজে পুরুষ সম্বন্ধে তরুণীদের যেমন কৌতূহল অনেকটা সেই রকম, যেন ধরা পড়লে তা লজ্জার কারণ হবে। ভয় ভাঙার পর গরিলা সমাজ সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহের সুযোগ পেলেন তিনি।

পুরুষ গরিলা এত বিরাট ও বলীয়ান যে তার দলকে আক্রমন করে এমন প্রাণী খুব বিরল—অবশ্য মানুষ ছাড়া। শ্যালারের দৃষ্টিতে তারা শান্তি ও সম্প্রীতির এক মৃদু মনোভাব নিয়ে দিন কাটায়। ছয় থেকে সতেরটি মিলে এক এক দল, পালের গোদা যে শক্তিধর পুরুষ সবাই তাকে সমীহ করে, 'এক বাক্যে' মেনে চলে। মাঝে মাঝে কোনও অর্বাচীন বেশী চঞ্চল হয়ে পড়লে নেতার কটমট চাউনি বা মাটিতে এক চড় তাকে ঠাণ্ডা করে। দুই মেয়েতে ঝগড়া লেগেছে, গালিগালাজে কান ফাটে, কর্তা চোখ পাকিয়ে তাকালেন, অমনি চেঁচামেচি বন্ধ। মানুষের ঘরে ছোটরা যে সব কড়ামেজাজী জ্যেষ্ঠদের কাছে ঘেঁষতে সাহস পায় না এ সব জেনে তাদের কথা মনে পড়লেও আসলে তেমন ভয়ের পাত্র নয় সে। গোলমাল যখন অসহ্য হয়ে ওঠে তখন সে তা বন্ধ করবেই, কিন্তু সাধারণত তার মেজাজটা ঠাণ্ডা ও অমায়িক, স্ত্রীরা গায়ে গা ঘষে, বাচ্চারা বিশাল বপুর উপর চড়ে হামাগুড়ি দেয়। অন্যান্য পশু শাবকদের মত শিশু গরিলারাও নিজেদের মধ্যে খেলে, শ্যালার দেখেছেন কেউ একলা খেলছে গাছের পল্লব ছিঁড়ে মাথায় চাপিয়ে, পাতাগুলি টুপির মত ঝুলছে চার পাশে ; অথবা কয়েক জন সারি বেঁধে এগিয়ে চলেছে, পিছনের বাচ্চা সামনেরটির পিঠে হাত রেখে—এই ধরনের খেলা মানব সমাজেও খুব স্বাভাবিক। আহার নিদ্রার ফাঁকে

বিশ্রামের সময়ে ছোটরা খেলছে, মায়েরা তাদের দেখাশোনা করছে, অন্যান্য বড়রা শান্ত হয়ে শুয়ে রোদ পোহাচ্ছে—এমন দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায়।

অবশ্য সর্বদা দিন এমন নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে কাটে না, গরিলাদেরও তাপ উত্তাপ আছে, বিশেষত কোনও কারণে ভয় পেলে। তখন তারা তা প্রকাশ করে চিৎকার ও বুক চাপড়ানি ছাড়াও ডাল পাতা ছুঁড়ে, সবটা ঘটে যেন কোনও আনুষ্ঠানিক রীতি অনুসারে। ধাড়ী মরদরা প্রথমে মৃদু ও ক্রমশ দ্রুত ডাক ছাড়ে, হয়তো তার মধ্যে থেমে একটা পাতা ছিঁড়ে দুই ঠোঁটের মধ্যে রাখে, তা দেখে অন্যরা তাড়াতাড়ি সরে পড়ে সেখান থেকে। তখন সে প্রথমে সোজা দাঁড়িয়ে নিজের বুকে, পেটে বা উরুতে অথবা অন্য কারও গায়ে চড় মেরে সেই গভীর ঢাকের আওয়াজটা করে। তার পর শুরু হয় প্রলয় নাচন, পাশের দিকে পা ফেলে কিছুটা গিয়ে হাত দুটি মাটিতে ফেলে পূর্ণোদ্যমে দৌড় মারে সে, পথে ডাল ভাঙে, যা পায় তার উপর প্রচণ্ড চড় মারে, দলের আর কেউ সেখানে থাকলে সে বেচারাও বাদ যায় না। অবশেষে মাটিতে সজোরে এক থাপ্পড় মেরে সে চার দিকে তাকায়, যেন হাত-তালির আশায়। ছোট বাচ্চারাও এই অনুষ্ঠানের এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণের মহড়া দেয়—হয়তো দু পায়ে দাঁড়িয়ে অথবা গোটা কয়েক চড় মেরে। শ্যালার মনে করেন গরিলারা অস্বস্তি, বিরক্তি, কৌতূহল ও সাহস অনুভব করে, কিন্তু তারা আবেগ প্রকাশে অনিচ্ছুক যদি না আশঙ্কা করে যে বিপদ আসন্ন।

যদিও শিমপানজির চেয়ে তারা আবেগ চেপে রাখে বেশী, তাদের নাকি চোখের জলও ফেলতে দেখা গিয়েছে। শিমপানজিদের স্বভাব নিঃসন্দেহে আমাদের চিত্তাকর্ষক, তা বলে গরিলা যে ভয়ংকর হিংস্র দৈত্য নয় তাও দেখা গেল, তাদের ছোট খাটো আচরণ অনেক সময়ে আমাদের সমাজে খুবই পরিচিত মনে হয়। এক পর্যবেক্ষকের বিবরণে আছে তাঁর সম্বন্ধে তাদের সন্দেহ ও ভয় ভেঙে যাওয়ার পর একদা তিনি যা দেখেছেন তা খাতায় লিখ-ছেন, এক গরিলা কিছু ক্ষণ তা লক্ষ্য করে কাছে এসে কলমটার দিকে হাত বাড়াল, সেটি পেয়ে সযত্নে ধরে পরীক্ষা করে আবার ফিরিয়ে দিল—শুধু মুখে ফুটল না ধন্যবাদ।

বনমানুষ ও মানুষের মস্তিষ্কের মৌলিক গঠন অনেকটা অনুরূপ, যেমন পিছন দিকে দৃষ্টির কেন্দ্র, মধ্যের ও পাশের অঞ্চলগুলি নিয়ন্ত্রণ করে বাক্, স্মৃতি, অঙ্গ সঞ্চালন, ইন্দ্রি-য়ের বোধ ইত্যাদি, সামনে চিন্তা শক্তি বা মনন যা মানুষে সবচেয়ে বেশী বেড়েছে। প্রোসিমিয়ানদের পরে বানরের মগজে বিশেষ বৃদ্ধির অনেকটা কাজে লেগেছে হাত, পা ও তাদের আঙুলের সহজ নিয়ন্ত্রণে, বাকি বৃদ্ধির অধিকাংশ বাড়িয়েছে দৃষ্টির প্রখরতা ও স্মৃতির ভাণ্ডার, সংক্ষেপে বলা চলে বানরের বৃহত্তর মগজ শিখবার ক্ষমতা প্রশস্ত করেছে।

কিন্তু বুদ্ধি, ক্ষমতা ও যোগ্যতার বিচারে মস্তিষ্কের ওজন বা পরিমাণ ছাড়াও বিবেচ্য দৈহিক ভারের কতটা অংশ তা—তিমি বা হাতির মগজ মানুষের তুলনায় অনেক বেশী ভারী, কিন্তু দৈহিক ওজনের অনুপাতে মানবিক মেধার উৎকর্ষ স্পষ্ট প্রতীয়মান। তৃতীয়ত মগজের আভ্যন্তর গঠন এবং বিভিন্ন অংশের আপেক্ষিক অনুপাতও অবশ্য বিচার্য। বর্তমান মানুষের মস্তিষ্ক বানরদের প্রায় ১০-১২ গুণ বড় এবং অনেক জটিল গঠন তার, কিন্তু বিগত আড়াই কোটি বছরে তার ফলে বহির্জগৎটা অনুভবের ক্ষমতা আমাদের বাড়ে নি, অগ্রগতি হয়েছে বাক্ শক্তি, স্মৃতি, উপলব্ধির সমন্বয় ও নৈর্ব্যক্তিক মনন শক্তির দিকে, সাদা কথায় বলতে গেলে মেধার ক্ষমতা বেড়েছে ইন্দ্রিয় ছেড়ে মনের দিকে।

মগজের মোট মাপটা গুরুতর বিষয়, কারণ তা যত বাড়ে তত তার মধ্যে কোষের সংখ্যা এবং পারস্পারিক যোগাযোগের জটিলতাও বাড়ে। সুতরাং বিজ্ঞানীরা প্রায়ই মস্তিষ্কের সাধারণ মূল্যায়নে আগে দেখেন মোট আয়তন, তার আর এক সুবিধা এই যে তা যন্ত্রপাতি দিয়ে মাপা যায়, সুতরাং অপরিবর্তনীয়। পক্ষান্তরে এ যাবৎ আমরা মানুষের সঙ্গে তুলনায় বনমানুষের স্বভাব আচরণ যা আলোচনা করেছি (শিল্প সৃষ্টি, যন্ত্রের ব্যবহার ইত্যাদি) তার বিচারে বিভিন্ন বিচারকের বিভিন্ন মত হতে পারে। বর্তমান মানুষ বা হোমো সেপিয়েনস এ পর্যন্ত সবচেয়ে মেধাবী প্রাণী, দেহের অনুপাতে তার মগজও বড়, গড় আয়তন ১৪০০ ঘন সেনটিমিটার যা হল লিটারের এক সহস্রাংশ (সিসি), যদিও নিম্নতম ও উচ্চতম সীমা প্রায় ১০০০ এবং ২০০০ সিসি। সে ক্ষেত্রে ওরাং, শিমপানজি ও গরিলার চরম সীমা প্রায় ৩০০ ও ৭৫০। গড় মাপ শিমপানজির ৪০০ সিসি, বৃহত্তর প্রাণী গরিলার ৫০০ সিসি। অভিব্যক্তির পথে বনমানুষকে অতিক্রম করে সর্বদা মানুষের মত হাঁটতে পেরেছে অস্ট্রালোপিথেকাস, গরিলা শিমপানজির মত মাঝে মাঝে হাতে ভর করে চলে নি, দেহে গরিলার চেয়ে অনেক ছোট হলেও দুইয়ের মগজের মাপ প্রায় সমান। বর্তমান মানুষের আগে ছিল আর এক মানুষ হোমো ইরেক্টাস, এই প্রজাতির মস্তিষ্কের পরিমাণ বনমানুষ ও স্বল্পমেধা কোনও হোমো সেপিয়েনসের মাঝামাঝি বলা যেতে পারে।

অসট্রালোপিথেকাস ও হোমো ইরেকটাস অবশ্য এখন আর নেই, তাদের মগজের মাপ পাওয়া গিয়েছে ফসিল খুলি থেকে। মেধার পরিমাণের মত ফসিল দাঁতের আকার আয়তনও নিকট প্রাণীদের সম্পর্ক নির্ণয়ে সাহায্য করে। কিন্তু একই প্রজাতির প্রাণীও যে কেউ ছোট কেউ বড় মগজের অধিকারী হয় তা আমরা একটু আগেই দেখেছি, আর দাঁতের পার্থক্য তো পরিচিত লোকের মধ্যেই অনেক জানি। এই সব ভেদাভেদ

সম্পূর্ণ এড়িয়ে ক্রমবিকাশের পথে কার কতটা নিকট বা দূর সম্পর্ক, বংশতরুর কোন কোন প্রশাখা আগে পরে ভাগ হয়েছে তা নির্ধারণ করতে যুক্তরাষ্ট্রে অপেক্ষাকৃত সম্প্রতি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের তিনটি পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে, জীব জগতে ভেদ বৈচিত্র্যের একেবারে গোড়ায় পৌঁছেছে এরা। এদের থেকে যে সংখ্যাগুলি পাওয়া যায় তা প্রজাতির অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্য, সুতরাং বর্তমান মানুষ ও বনমানুষদের সম্পর্ক হিসাব করতে কাজে লাগানো যায়। আমরা জানি দেহ-কোষের বংশকণিকা বিভিন্ন জীবের বিবিধ বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে, এই কণিকার অন্তর্গত দীর্ঘ নিউক্লিইক অ্যাসিড অণুর আকস্মিক পরিবর্তনে ক্রমে প্রজাতির রূপান্তর হয়ে নতুন প্রাণী দেখা দেয়—এই পার্থক্যের ফলেই শিমপানজি ও মানুষ পৃথক প্রাণী। দুটি প্রাণীর নিউক্লিইক অ্যাসিড যত অনুরূপ, অভিব্যক্তি তরুতে তারা তত কাছাকাছি, এবং এই পদ্ধতির উদ্ভাবকরা দেখেছেন নর দেহের তুলনায় শিমপানজির এই আণবিক প্রভেদ আড়াই শতাংশ, গরিলার সামান্য বেশী, বানরের ১০ শতাংশের বেশী।

বিভিন্ন বংশকণিকার গঠন অনুযায়ী দেহে ভিন্ন ভিন্ন প্রোটিন তৈরি হয়, সুতরাং কণিকার পরিবর্তন প্রোটিনেও প্রতিফলিত হবে। আমরা দেখেছি কয়েকটি অ্যামিনো অ্যাসিড নানা ভাবে সাজিয়ে জুড়ে বিবিধ প্রোটিনের অণু গঠিত হয়, তাদের পার্থক্য এই অনুক্রমিক সাজ বা বিন্যাসে। সুতরাং নিউক্লিইক অ্যাসিড অণুর পরিবর্তন হলে প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিডও বদলায়, স্থান বিশেষে একের জায়গা নেয় আর একটি। হিমোগ্লোবিন এক প্রোটিন, তার থেকেই রক্তের রক্তিমা, এতে অ্যামিনো অ্যাসিডের সংখ্যা ২৮৭, মানুষ ও শিমপানজির হিমোগ্লোবিনে তাদের অনুক্রম একই, গরিলার সঙ্গে মানুষের পার্থক্য দু জায়গায়। এর সঙ্গে তুলনীয় মানুষ ও ঘোড়ায় প্রায় ৪৩ জায়গায় অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রভেদ, অর্থাৎ বনমানুষ ও মানুষের যৌথ শাখাটি অনেক আগে ঘোড়ার থেকে সরে এসেছে, তার পর ভাগ হয়েছে বনমানুষ ও মানুষ।

পর পর একটি একটি করে অ্যামিনো অ্যাসিড সনাক্ত করা ক্লান্তিকর ও সময়সাপেক্ষ কাজ, বিকল্প এক পদ্ধতি প্রোটিনের পার্থক্য ধরে অনেক সহজে। বিজাতীয় কোনও বস্তু শরীরে ঢুকলে তার প্রতিষেধক বিশেষ অ্যানটিবডি সেখানে তৈরি হয়, রোগের জীবাণু অনেক সময়ে প্রাণীর এই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার কাছে হার মানে, অন্য প্রাণীর দেহে অ্যানটিবডি সৃষ্টি করিয়ে তাও রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার হয়। কোনও প্রাণীর দেহে বিজাতীয় এক প্রোটিন অনুপ্রবেশ করালে সেই প্রোটিনের জুড়ি অ্যানটিবডি তৈরি হবে, তা বার করে কোনও পাত্রে আলাদা করে সেই প্রোটিনের সঙ্গে মেশালে তাদের

তৎক্ষণাৎ রাসায়নিক মিলনে যুক্ত হতে দেখা যায়। পরীক্ষকরা প্রথমে মানব শোণিতের অ্যাল্‌বুমিন প্রোটিন খরগোশের শরীরে ঢুকিয়ে তার জুড়ি অ্যানটিবডি বানালেন, তার পর তা যখন নানা প্রাণীর অ্যালবুমিনের সঙ্গে মেশানো হল তখন এই সব অ্যালবুমিন অণুর গঠন পার্থক্য অনুসারে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দেখা গেল—প্রতিটি অ্যামিনো অ্যাসিডকে এক এক করে চিনতে হল না।

এই গঠন পার্থক্য দেখা দিয়েছে অভিব্যক্তির ফলে, সুতরাং মানুষের অ্যালবুমিন-অ্যানটিবডির সঙ্গে তার নিজের অ্যালবুমিনের সংযোগ হয় সম্পূর্ণ, ঘোড়ার অ্যালবুমিনের সঙ্গে সামান্য, কারণ তার আণবিক গঠনে অনেক পার্থক্য। এই উপায়ে দেখা গিয়েছে মানবিক অ্যালবুমিনের সঙ্গে গরিলা বা শিমপানজির পার্থক্য মাত্র আট, গিবনের ১৪, ভারতের সুপরিচিত রিসাস বানরের ৩২ ; এর সঙ্গে তুলনীয় মানুষ বা শিমপানজির সঙ্গে মাংসাশী প্রাণীদের প্রভেদ সংখ্যা ১৭৩। সংখ্যাগুলি অভিব্যক্তির পথে অ্যালবুমিন অণুর পরিবর্তন নির্দেশ করে, তার থেকে প্রাণীদের পারস্পরিক সম্পর্ক কত নিকট তার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়, অবশ্য এই প্রোটিনটির গণ্ডির মধ্যে।

বনমানুষদের মধ্যে শিমপানজি ও গরিলার সঙ্গে যে আমাদের নিকটতম সম্বন্ধ তা আগেই অনুমান করা গিয়েছে, এই আধুনিক কৌশলগুলি তার দৃঢ় সমর্থন দিচ্ছে। কিন্তু সেটা জ্ঞাতি সম্পর্ক, তারা কেউ আমাদের সাক্ষাৎ পূর্বপুরুষ নয়, বংশতরুর উপর দিকে তাদের প্রশাখা ভাগ হয়ে গিয়েছে, তাদের এবং মানুষের জন্মদাতারা আজ বিলুপ্ত। জীব-বিজ্ঞানীরা তা বোঝেন এই দেখে যে বর্তমান বনমানুষরা এক এক বিষয়ে এত বেশী বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে যা মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। খুলির কোনও কোনও অংশে, চোয়ালের হাড়ে এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়, এ সব অংশে বরং মানুষ এবং বর্তমান বন-মানুষদের পূর্বপুরুষে সাদৃশ্য বেশী, সুতরাং মানুষের জনক হতে হলে গরিলা বা শিমপান-জিকে কিছুটা পিছিয়ে যেতে হয় ক্রমবিকাশের পথে। তারা ও মানুষ যে এক আদি শাখার বিভিন্ন প্রশাখা এই তার যুক্তি। প্রথম প্রাইমেট থেকে শুরু করে বংশতরুর অনেক ডালপালা ছাড়িয়ে একেবারে শেষে দেখা দিয়েছে সেরা প্রাইমেট মানুষ।

অলিগোসিনের শেষে আমরা বর্তমানের আড়াই কোটি বছর পর্যন্ত এগিয়ে এসেছি, তার পর তিনটি ছোট অধিযুগে মানুষ ও তার নিকটতম পুরোগামীদের ক্রমবিকাশ বিস্তারিত আলোচনার বিষয়।

বিজ্ঞানীরা অনেকে মনে করেন মানুষের জন্ম শিমপানজি গরিলার দেশ আফ্রিকায়, তার একটা কারণ তাদের সঙ্গে আমাদের সাদৃশ্য, অবশ্য তা ছাড়া ফসিলের সাক্ষ্যও আছে,
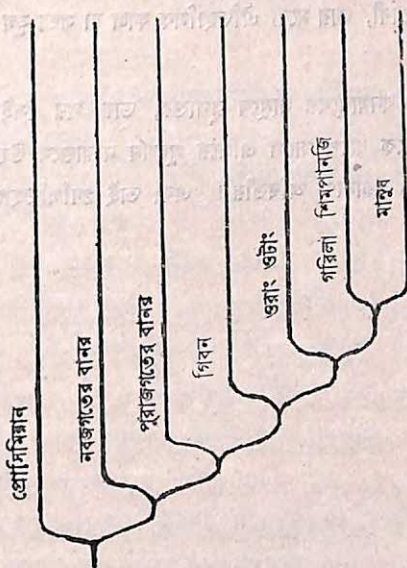
চিত্র ১৫। প্রাইমেট বর্গের অভিব্যক্তি।

যেমন গত অধ্যায়ে উল্লিখিত ঈজিপটোপিথেকাস। কিন্তু এশিয়ার পক্ষেও বেশ কিছু যুক্তি আছে, যদিও আপাতত সে পিছনে পড়েছে।

অনেকের মতে সবচেয়ে সাম্প্রতিক যে অগ্রদূত একাধারে শিমপানজি গরিলার ও মানুষের জন্ম দিয়েছে সে ছিল অনেকটা শিমপানজিরই মত দেখতে ছোট খাটো প্রাণী, নাম ড্রায়োপিথেকাস, ধাম আফ্রিকা ও এশিয়া, ভারতেও সে রেখে গিয়েছে অস্থি। ফসিলের নজির থেকে তার পূর্বপুরুষ ও মানুষ পর্যন্ত উত্তরপুরুষদেরও সূত্র অনুসরণ করেছেন বিজ্ঞানীরা, এখনও করছেন।

প্রাণের ইতিহাসে মানুষ নিতান্তই শিশু, প্রায় সদ্যোজাত। রূপক দিয়ে বলা যায় পৃথিবী যদি সৃষ্টি হয়ে থাকে পয়লা বৈশাখ, তো প্রায় আড়াই মাস কেটে গেল প্রথম অজানা প্রাণীর অপেক্ষায়। মাঘ ফালগুনে প্রাচীনতম মেরুদণ্ডবিহীন প্রাণীর আবির্ভাব, মেরুদণ্ডধারীরা দেখা দিল তার মাত্র পাঁচ ছ দিন পরে। স্তন্যপায়ীরা যখন এল তখন বছর ফুরাতে সপ্তাহ দুই বাকি। মানুষের সৃষ্টি নব বর্ষের বড় জোর ছ ঘণ্টা আগে, আজকের খাঁটি মানুষ মাত্র

চার পাঁচ মিনিটের প্রাণী, তার মধ্যে ঐতিহাসিক কাল বা সভ্য যুগ এক মিনিটেরও কম—নিমেষ মাত্র।

কিন্তু তা হলেও বনমানুষের মানুষে রূপান্তর, তার পর সেই প্রথম বনমানুষ-প্রায় মানুষের আবির্ভাব থেকে ধাপে ধাপে এগিয়ে সুদর্শন নরোত্তমে উত্তরণ আমাদেরই পুরাবৃত্ত—তার আকর্ষণ ও রোমাঞ্চ অদ্বিতীয়। এবং তাই প্রাগিতিহাসের মানুষ এক পৃথক মহাকাহিনীর বিষয়।

নির্দেশিকা

(প্রধান বিষয়গুলির প্রধান উল্লেখ ; দ্র. = দ্রষ্টব্য)

অজীবীয় azoic
অতিনোভা supernova
অতিবেগনি ultra-violet
অতিমহাদেশ supercontinent
অন্ধকূপ black hole
অবায়ুজীবী anaerobic
অভিব্যক্তি evolution
অভিব্যক্তিবাদ theory of evolution
অমেরুদণ্ডী invertebrate

আঙ্গারিক গ্যাস carbon dioxide

উপপ্রজাতি subspecies

ক্রমবিকাশ evolution

গণ genus
গেছো ছুঁচো tree shrew
গোত্র family

চুম্বকী ক্ষেত্র magnetic field

ছত্রাক fungus
ছেদক দাঁত canine tooth

জাতি race
জীবাশ্ম fossil

তেজস্ক্রিয় radioactive

নবজীবীয় cenozoic
নবপ্রস্তর neolithic
নিষিক্ত fertilized
নীহারিকা galaxy

পর্ব phylum
পুরাজীবীয় palaeozoic
পুরাপ্রস্তর palaeolithic
প্রকার variety
প্রজন breeding
প্রজাতি species
প্রাকৃতিক নির্বাচন natural selection
প্রাগিতিহাস prehistory
প্রাণী animal

বর্গ order
বংশকণিকা gene
বংশকণিকার আকস্মিক পরিবর্তন mutation
বায়ুজীবী aerobic
বায়ুমণ্ডল atmosphere

মধ্যজীবীয় mesozoic
মহাকাল time
মহাকাশ space
মহাজাগতিক রশ্মি cosmic ray
মহাদেশীয় চলাচল continental drift
মেরুদণ্ডী vertebrate

শেওলা algae
class শ্রেণী

সর্গ kingdom
সৌরশিখা solar flare
স্তন্যপায়ী mammal

হিমবাহ glacier

মহাকাশে অন্ধকূপ কি বস্তু···পৃথিবীর বয়স কত···প্রথম প্রাণীর চেহারা কেমন···নেস হ্রদে কি কোনো লুপ্ত প্রাণী গুপ্ত আছে···পাখির আগে কারা আকাশে উড়েছে···এ যাবৎ বৃহত্তম স্থলচর প্রাণী কি···ডাইনোসররা সব একসঙ্গে মরল কেন···জিরাফের গলা লম্বা হল কি করে···মানুষ ও শিম্পাঞ্জি পৃথক প্রাণী কেন···এমন আরো অনেক প্রশ্নের জবাব আছে এই ক্ষুদ্রাকার বইটিতে।

শচীন্দ্রনাথ বসুর 'প্রাগিতিহাসের মানুষ' গ্রন্থটি রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিল, 'মানুষের আগে' তার প্রথম ভাগের পরিবর্ধিত ও আধুনিক সংস্করণ। বিশ্বের সৃষ্টি থেকে আরম্ভ করে কি করে পৃথিবীর জন্ম হল এবং ক্রমে এই গ্রহে প্রাণের অঙ্কুর দেখা দিল এতে আছে সেই কাহিনী, এবং তার পর জীব জগতে একের পর এক বিভিন্ন ধাপে যে সব প্রাণী গোষ্ঠীর সূত্র ধরে মানুষের আগমন তাদের ধারাবাহিক পরিচয়। সৃষ্টির পটে মানুষের উৎপত্তি ও স্থান বুঝতে এমন একখানি বই অপরিহার্য। নানা বৈজ্ঞানিক পত্র পত্রিকা থেকে লেখক সযত্নে সংগ্রহ করেছেন অত্যাধুনিক আবিষ্কার ও গবেষণার খবর যা এখনো দেশে বা বিদেশে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি।

বিজ্ঞানের কৃতী অধ্যেতা শচীন্দ্রনাথ বসু লনডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডকটর উপাধি লাভ করেন, তাঁর কর্মজীবনও প্রাণিবিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণায় কেটেছে। আবার তরুণ বয়স থেকে তিনি সাহিত্য রচনায় আকৃষ্ট, এই ক্ষেত্রে তাঁর ক্ষমতার সাক্ষ্য দেয় গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদি বিবিধ সৃষ্টি। বাংলা সাহিত্যে এই দুই ধারার সংযোগ বিরল, এই কারণে তাঁর বৈজ্ঞানিক রচনা বিজ্ঞান-অজ্ঞানী বা অল্পবয়স্ক পাঠকদেরও হৃদয়গ্রাহী হয়। সরল অনাড়ম্বর ভাষা ও সাবলীল লিখনভঙ্গীর গুণে এই বইতে জানার বস্তু হয়েছে উপন্যাসের মত সরস।